সাগরতলের রহস্যময়তা

হাফেজা হক অদ্বিতী

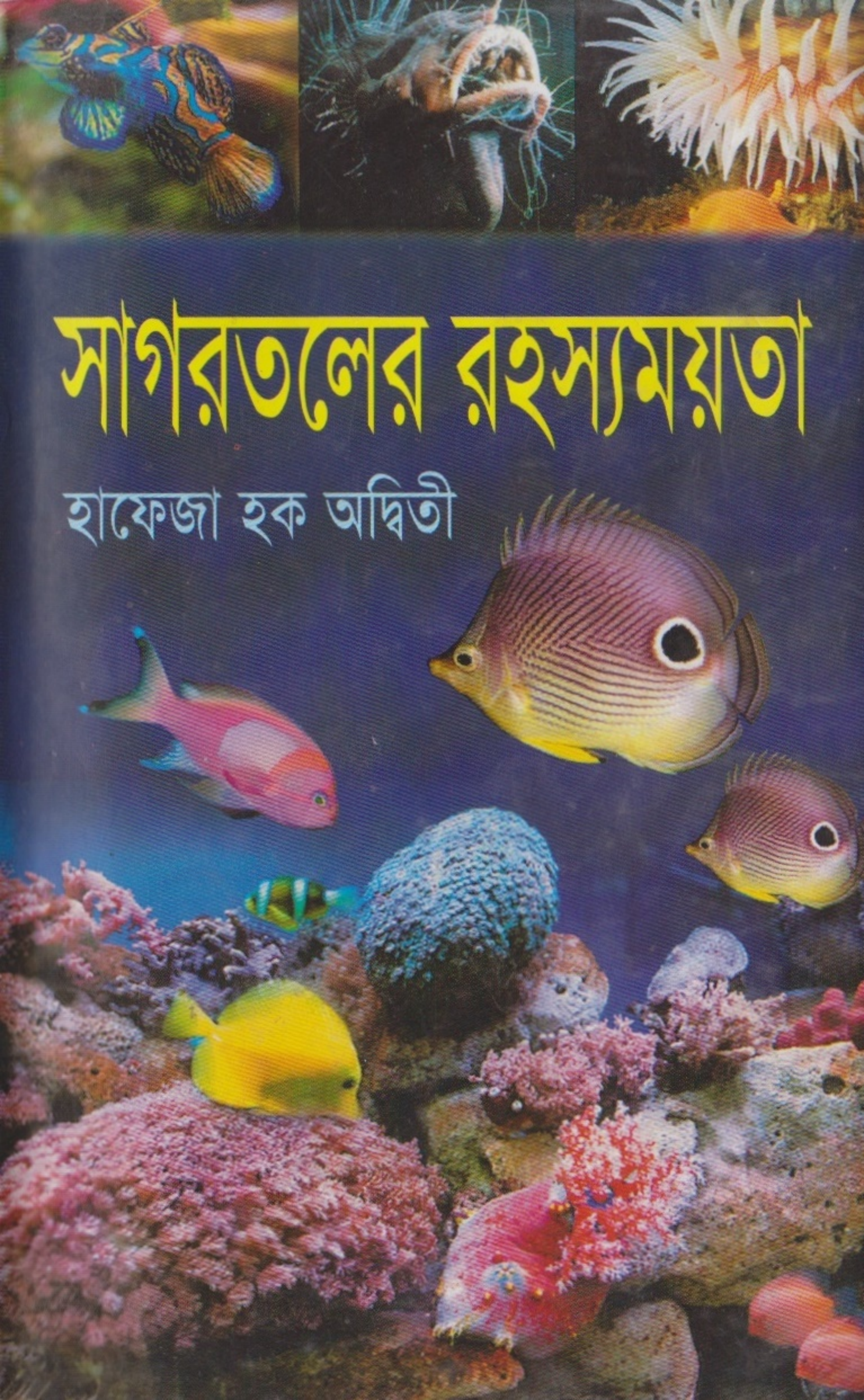

সাগরতলের রহস্যময়তা

হাফেজা হক অদ্বিতী
(ইলেকট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার)
এমডি. ডিজায়ার পাবলিকেশন্স)

Book No:....................
JNI Science Library

www.pathagar.com

সিঙ্গাপুর পরিবেশক ॥ শহীদ ট্রাভেল্‌স অ্যান্ড ট্যুরস প্রাঃ লিঃ
১৮১ কিচেনার রোড, ০১-১২/১৩ নিউ পার্ক হোটেল শপিং আর্কেড, সিঙ্গাপুর ২০৮৫৩৩
উত্তর আমেরিকায় পরিবেশক ॥ মুক্তধারা জ্যাকশন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ॥ সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
FAX : 020 72475941

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০১৩

প্রকাশক : মো: মিজানুর রহমান, দি স্কাই পাবলিশার্স, ৩৮/২ক বাংলাবাজার
(মান্নান মার্কেট, ৩য় তলা) ঢাকা ১১০০, সেল : ০১৭১৪৩৯১০৯০
০১৯২৫৭৬০৭৬৬, ০১৬৭০৭৩৫৮০৮, ০২৭১১১৯৭৯
অক্ষরবিন্যাস : কমপিউটার ল্যান্ড ৪৭/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ : নকশী প্রিন্টার্স ৩৪ আর. এম. দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ : সুখেন দাস

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-70145-0089-9

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মহাসাগর এবং এর মহারহস্য সম্পর্কে
জানতে আগ্রহী সকল শিক্ষার্থীকে।
পানির নিচেও যে রয়েছে
আরেক পৃথিবী।
রয়েছে জ্ঞানের সুবিশাল ভান্ডার।
সকলের মধ্যে জানার এই আগ্রহটুকু
জন্মানোই আমার উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

আমাদের জানার পরিধি বাড়াতে হবে মহাকাশ থেকে মহাসমুদ্রের অতল গভীর পর্যন্ত। কারণ জানার শেষ নেই। আর আমাদের আগ্রহও সীমাহীন। মাত্র কিছুদিন আগেও আমরা বিপদসংকুল আর তরঙ্গবহুল সাগর পাড়ি দিয়ে দূর দেশে যাবার জন্য ব্যবহার করতাম কাঠের পাল তোলা জাহাজ। ধীরগতির আর প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল সেই জাহাজের দিন পেরিয়েছে। দিন বদলের পালায় বদলেছে গতি। কাঠের জাহাজের জায়গায় এসেছে আধুনিক জাহাজ। আবিষ্কৃত হয়েছে সমুদ্রের অতল গভীরে চলার উপযোগী সাবমেরিন। আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে পানির নিচের সমুদ্রের সুবিশাল রহস্যের ভান্ডার।

আমরা উপরের দিকে তাকালে দেখতে পাই মহাশূন্য আর মহাকাশ। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের আশির্বাদে মহাকাশের অনেক তথ্যই আমাদের জানা। তবে, পানির নিচের পৃথিবী সম্পর্কে আমরা এতোদিন খুব বেশি জানতে পারিনি। কিন্তু সভ্যতার ক্রমোন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের জানার পরিধি বেড়েছে। সমুদ্রের অতল রহস্যও এখন আর রহস্যে ঘেরা নয়। এসব রহস্যও একটু একটু করে উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। এখনও অনেক রহস্যের যবনিকা উঠতে সময় লাগবে। তবুও যতটুকু জেনেছি আমরা সেটুকুই বা কম কিসে।

এই বইতে আমি বিভাগভিত্তিক কিছু বিষয় সাজিয়েছি এমনভাবে– যাতে আমাদের মধ্যে যাদের সবেমাত্র জ্ঞানের স্ফুরণ ঘটতে শুরু করেছে তারা এই বিষয়গুলো জানার জন্য আরও আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। আর সেই সাথে জানতে পারবে সমুদ্র বিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর।

বইটিতে ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইট থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ইন্টারনেটের বহুল প্রচলিত সাইট হিসেবে স্বীকৃত www.biggani.com-এর **মাহফুজ, অশোক সেনগুপ্ত, সাজ্জাদ বিন লতিফ, শিল্পী আহম্মদ ও নাসিম সাহনিক** এবং kidz.bdnews24.com--এর **মেহেদী বাবু, মাহফুজ-উল-ইসলাম, নাবীল আল জাহান, মিন্টু হোসেন, অনুপম দেব কানুনজ্ঞ, শাকিল ফারুক, অনিশ দাশ অপু, বিজয় মজুমদার, ফাহাদ** সাহেবের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। কারণ তাদের বেশ কিছু লেখা এই বইটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তাদেরকে জানাই হৃদয়ের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা। সময়াভাবে তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। আশা করছি আমার এই অপরাগতা তারা নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

– হাফেজা হক অদ্বিতী

আগারগাঁও, ঢাকা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অতলান্ত সমুদ্র ১১
সমুদ্রের পানি রাশি..১৯
পৃথিবীর আবহমন্ডল ও সমুদ্র ২২
সমুদ্র তলের জগৎ ২৩
গভীর সমুদ্রের কথা..২৬
সুবিশাল সমুদ্র ২৬
সমুদ্রের গভীরতা ২৮
বরফের জগৎ..২৯
সমুদ্রের মুক্তো ৩০
বিচিত্র সামুদ্রিক প্রাণী..৩৩
প্রাচীনকালের সমুদ্র ৪৬
সমুদ্র সৃষ্টির বিভিন্ন পর্ব..৪৭
শেষ যুগের সমুদ্র ৪৮
প্রাণের উৎস সমুদ্র ৫১
সমুদ্রের পানির উপকারিতা ৫৩
স্থলভাগের উচ্চতা ৫৪
মহাসমুদ্র থেকে পৃথিবী..৫৪
সমুদ্রের প্রাচীন উদ্ভিদ ৫৮
পৃথিবীর প্রথম মাছ..৬৪
সমুদ্রের প্রাণী ৬৪
সামুদ্রিক প্রাণীর বৈচিত্র্য ৬৮
সামুদ্রিক প্রাণীর প্রকরণ ৭২
বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক মাছ..৭৩
প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য ৭৭
সামুদ্রিক মাছের প্রজাতি..৮০
স্টার ফিশ..৮২
শার্ক বা হাঙর ৮৪
পানির দানব গ্রেট হোয়াইট শার্ক ৮৫
গ্রেট হোয়াইট শার্ক-এর অজানা তথ্য ৮৭
বামবো শার্ক ৮৮
নার্স শার্ক ৮৯
স্যান্ড শার্ক ৯০
বুল শার্ক ৯০
বাঘা হাঙ্গর বা টাইগার শার্ক ৯১

www.pathagar.com

হ্যামার হেড শার্ক ৯২
থ্রেসার শার্ক ৯৩
গ্রেরিফ শার্ক ৯৩
কোরাল নামের প্রাণী ৯৪
কোরাল রিফ..৯৫
কোরাল ব্যাঙ্ক..৯৬
রিফ যেভাবে গড়ে ওঠে..৯৭
রিফ গঠন প্রক্রিয়া..৯৭
আজব প্রাণী অক্টোপাস ৯৯
অক্টোপাসের শিকার ধরা..১০১
অক্টোপাসের খাওয়ার ধরন..১০২
অক্টোপাসের জন্মবৃত্তান্ত ১০৩
অক্টোপাসের বৈশিষ্ট্য ১০৪
পানির রাজা তিমি..১০৬
তিমি মাছ নয়..১০৬
নীল তিমি ১০৮
তিমির জাত ও বৈশিষ্ট্য..১০৮
বাংলাদেশের তিমি ১০৯
তিমির ফোয়ারা ১১১
জলদানব টাইগারফিশ..১১৩
পানির প্রাণী সীল..১২০
সমুদ্রের বিস্ময় ডলফিন ১২১
ডলফিনের বুদ্ধিমত্তা ১২১
ডলফিনের শরীর ১২২
ডলফিনের শ্বাসযন্ত্র..১২৩
ডলফিনের খাদ্যাভ্যাস ১২৪
আলাদা প্রজাতির ডলফিন ১২৫
বুদ্ধিমান ডলফিন ১২৬
সাধারণ ডলফিন ১২৬
ডলফিনের দাঁত..১২৭
বাংলাদেশের ডলফিন..১২৭
বাংলাদেশের নদীর ডলফিন শুশুক ১২৮
সবসময় চলমান ডলফিন..১৩০
স্যান্ড-বাবলার ক্র্যাব ১৩২
কোপ্লড ১৩৩

www.pathagar.com

সাকার মাউথ ক্যাট ফিশ ১৩৪
সামুদ্রিক ক্রীল ১৩৫
ভয়ংকর জেলি ফিশ ১৩৫
বিগ রেড জেলিফিশ ১৩৬
সী হর্স বা সিন্ধুঘোটক ১৩৭
গভীর পানির টুনা মাছ ১৪২
আলোময় স্কুইড ১৪৫
কানা মাছ স্টিজিখথিস টাইফলপস ১৪৬
ফ্লাইং ফিশ বা উড়ন্ত মাছ ১৪৭
বুল মাছ বা ব্যাথোসাইরো ১৪৭
ব্ল্যাক কার্প ১৪৮
মান্দারিন ফিশ ১৪৮
মস ফিশ ১৪৯
স্তন্যপায়ী মাছ ১৫০
আর্চার ফিশ তীরন্দাজ মাছ ১৫৩
পাতাবহুল সাগর ড্রাগন ১৫৪
জীবন্ত শৈবাল বা সমুদ্র বোলতা ১৫৫
সানফিশ ১৫৬
ইলেকট্রিক ঈল মাছ ১৫৬
এঞ্জেল ফিশ ১৫৭

লেখিকার অন্যান্য বই

* রহস্যময় মহাকাশ
* বিজ্ঞানের এনসাইক্লোপিডিয়া
* শিশু-কিশোর নলেজ ব্যাংক
* বৈচিত্র্যময় জ্ঞানের জগৎ
* কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি
* জ্ঞান-বিজ্ঞানে কম্পিউটার
* শিশু-কিশোর বিজ্ঞান কোষ
* জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার কথা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অতলান্ত সমুদ্র

বিজ্ঞানীরা বলেন, সমুদ্রই আসলে প্রাণের উৎস। কারণ, গোড়াতে একটাই সমুদ্রে ঢাকা ছিল পৃথিবী। আর তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা উদ্ভিদের মতো প্রথম প্রাণের সৃষ্টিও পানিতে। আর ঐ সব পানির প্রাণীও ছিল কিন্তু মাত্র একটা কোষ দিয়ে তৈরি। এগুলো অবশ্য নামেই প্রাণী। চালচলনে ছিল অনেকটাই উদ্ভিদের মতো। এই এককোষী প্রাণী বা অ্যামিবা নামে পরিচিতর বংশধররা কিন্তু আজও পৃথিবীতে টিকে রয়েছে।

পৃথিবীর প্রথম প্রাণী হচ্ছে প্রোটোজোয়া বা এককোষী প্রাণী। এই সব এককোষী প্রাণী দীর্ঘদিন ধরে আস্তে আস্তে বদলাতে বদলাতে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বহুকোষী প্রাণী। প্রাণের সৃষ্টি থেকে প্রাণের বিকাশের বহুকাল এরা শুধু পানিতেই ছিল। প্রাণের বিকাশ শুরু হওয়ার পর আস্তে আস্তে এলো বিভিন্ন রকমের প্রাণী। এরা সবাই অস্থিহীন প্রাণী আর এদের চেহারাও অদ্ভূত অদ্ভুত। কেউ কেউ দেখতে একদমই থলথলে জেলীর মতো। কারো চেহারায় শুধু কয়েকটা রঙ ছাড়া আর কিছুই নেই। কেউ আবার একদম একটা ফুলের মতো। এদের কেউ চ্যাপ্টা কেউ গোল কেউ বা আবার একতাল মাংসপিণ্ডের মতো। আজকের সমুদ্রের বিভিন্নরকম পোকা-মাকড় সেই শ্রেণীর। এরা সকলেই এই সব

www.pathagar.com

শ্রেণীতে পড়ে। এদের অনেকেই কিন্তু বড় বড় হতো– যেমন অক্টোপাস।

এইভাবে বেশ কিছুকাল কেটে যাবার পর দেখা গেল কিছু কিছু প্রাণীর গায়ে একটা শক্ত খোলসের মতো হয়েছে। শামুক, গেঁড়ি, গুগলি, শংখ, ঝিনুক প্রভৃতি এই পর্যায়ের। সেই সময় অবশ্য এদের চেহারা বিরাট বিরাট হতো। এই সব খোলাওয়ালা প্রাণীদেরও অনেক পরে এসেছে মাছ। অস্থিওয়ালা প্রথম প্রাণী হল মাছ। প্রোটোজোয়া বা এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তনের ধারা বেয়ে মাছের আবির্ভাব হতে বেশ কয়েক কোটি বছর কেটে গেছে।

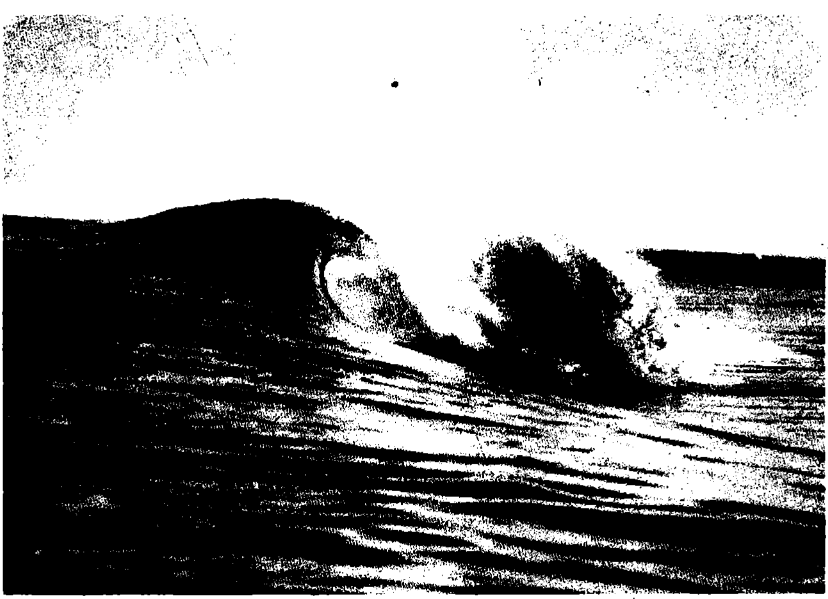

www.pathagar.com

এইভাবে প্রাণের সৃষ্টি বেশ কিছুকাল পরে আস্তে আস্তে ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে পৃথিবীতে অস্থিযুক্ত প্রাণীরা এসেছিল। আবার ধীরে ধীরে নানান ধরনের মাছ, খোলাওয়ালা প্রাণী প্রভৃতিতে সমুদ্র ভরে গেল। যতদিন যায় পুরাতন প্রাণীরা বংশ বৃদ্ধি করতে করতে সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেল। ধীরে ধীরে নতুন নতুন

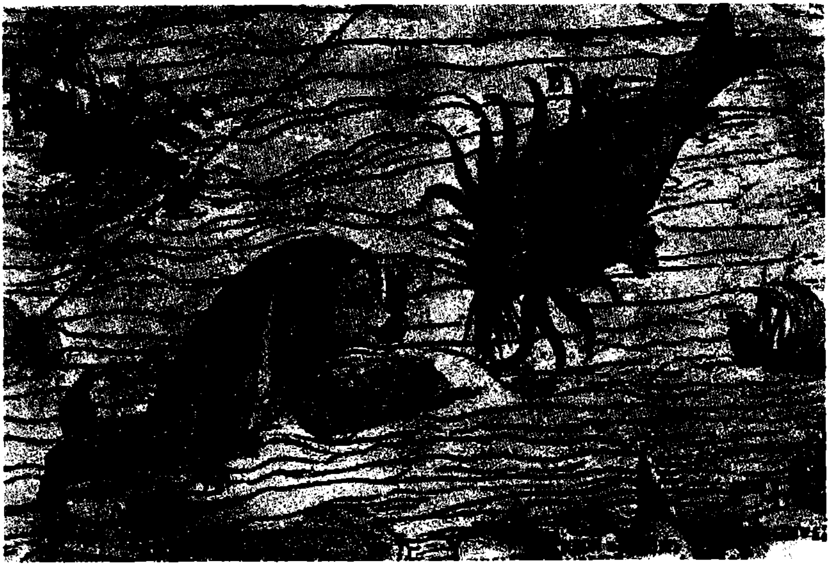

প্রাণীর সৃষ্টি হতে লাগল। আবার নতুন নতুন উন্নত প্রাণীদের জায়গা ছেড়ে দিতে গিয়ে প্রথম দিকের কিছু কিছু প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেল। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ক্রমশ পানিতে প্রাণীদের স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব দেখা দিতে শুরু করল। অবশ্য মাংসাশী প্রাণীদের বেলায় কিন্তু তা হয়নি। খাদ্যাভাব দেখা দিল নিরামিষভোজী প্রাণীদের। আবার বড় বড় প্রাণীদের কাছে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট প্রাণীরা ক্রমশ নাস্তানাবুদ হতে হতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অন্য কোন উপায় বের করাতে ব্যস্ত হল।

এদিকে এই দীর্ঘ সময়ে স্থলভাগেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গোড়ার দিকে স্থলভাগে প্রচুর আগ্নেয়গিরি ছিল। তারা সব সময়ই অগ্ন্যুৎপাত করত। বাতাসে পর্যাপ্ত অক্সিজেন ছিল না। এ ছাড়াও নানা রকম গ্যাস ধোঁয়া প্রভৃতি মিলে মিশে এমন অবস্থা ছিল যে সূর্যালোকই ঠিকমত আসত না। সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে এই সব মেঘ কেটে যেতে শুরু করল। তারপর আস্তে আস্তে পানির

www.pathagar.com

ধারে ডাঙায় উদ্ভিদের জন্ম হল। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত স্থলভাগই বড় বড় উদ্ভিদে ঢেকে গেল। এইভাবে যখন ক্রমশ স্থলভাগ একটু একটু করে সুন্দর হয়ে উঠছে, পানিতে ততই ভীড় বাড়ছে। আদিম সমুদ্রে, যখন এরা ছাড়া আর কোন প্রাণীই পৃথিবীতে ছিল না, তখন এরা দল বেঁধে সমুদ্রে ভেসে বেড়াত। দল বলতে অবশ্য দু দশটা ভেব না। এক একটা দলে বহু কোটি প্রোটোজোয়া থাকত। ক্রমশ যত দিন যেতে লাগল এদের সংখ্যা বাড়তে লাগল, সেই সঙ্গে এদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। আগেই বলেছি, এদের মধ্যে উদ্ভিদ এবং প্রাণী– এই দুয়েরই লক্ষণ ছিল। সংখ্যায় যখন এই সব প্রোটোজোয়া অনেক বেড়ে উঠল, তখন তাদের কোন কোনটার মধ্যে দেখা গেল উদ্ভিদের লক্ষণ বেশি করে ফুটে উঠছে, আবার কোন কোনটার মধ্যে প্রাণী। তবে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই মনে করেন, প্রাণী নয়, উদ্ভিদেরই জন্ম হয়েছে আছে।

এদিকে সমুদ্র পানিতে খাদ্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়তে থাকায় কিছু কিছু প্রোটোজোয়া সমুদ্রের ধারে ডাঙার কাছে থাকতে শুরু করে। তৈরি হয় শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের। কিন্তু কোন প্রাণী তখনও ডাঙায় বা সমুদ্রের ধারে জন্ম নেয়নি। প্রোটোজেয়ো থেকে প্রথমে

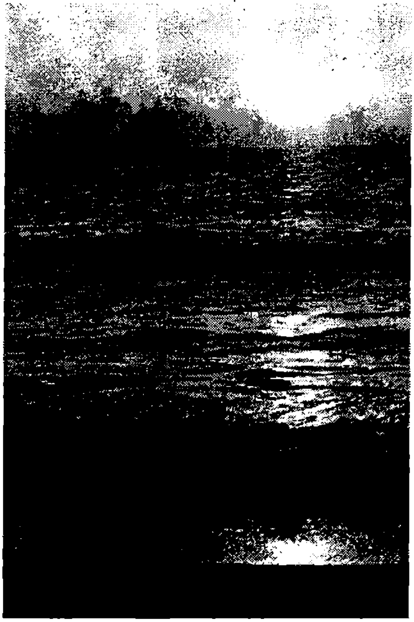

www.pathagar.com

নিম্নশ্রেণীর প্রাণী, তারপর উভচর প্রাণী, তারপর ডাঙার প্রাণী সৃষ্টি হয়েছিল– কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

যাহোক, ধীরে ধীরে পানির নিরামিষাসী প্রাণীরা ডাঙার খাদ্যের দিকে নজর দিল। প্রথম প্রথম তারা পানির ধারে ধারে ডাঙায় যে সব ছোট ছোট গাছপালা আছে তা খেতে শুরু করল। এই সব জলজ প্রাণীরা পানিতে কানকোর সাহায্যে নিশ্বাস নিত। কাজেই পানির উপরে গলা বাড়িয়ে ভোজনপর্ব সমাধা করে আবার পানিতেই ডুব দিত। এইভাবে তারা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠল আরো বেশীক্ষণ

পানির উপরে মাথা রাখার। ক্রমে এরা ডাঙায় উঠে এলো। কিন্তু ডাঙায় তো আর কানকোর সাহায্যে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না আর পাখনার সাহায্যে চলাফেরাও করা যায় না। তাই তাদের প্রথম দিকে পাখনাগুলোই হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলাফেরার কাজে লাগাতে হতো।

এইসময় যেসব প্রাণীর সৃষ্টি হল তাদেরকে বলা যেতে পারে অ্যামফিবিয়াস। অ্যামফিবিয়াস হল সেই সমস্ত প্রাণী যারা পুরোপুরি পানির উপর নির্ভরশীল। যেমন ব্যাঙ। ব্যাঙাচিরা কিন্তু পুরোপুরি পানির প্রাণী। পরে বড় হবার সাথে সাথে চেহারা পাল্টিয়ে ফেলে ডাঙাতে থাকবার উপযুক্ত হয়ে যায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে এই বিবর্তনের সবগুলোই কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে হয়েছে।

www.pathagar.com

এই সময়ের একটা প্রাণী হল ইকথিয়সরাস। ইকথিয়স মানে হল মাছ আর সরাস মানে হল কুমীর জাতীয়। এদের স্বভাব ছিল কিছুটা মাছের আবার কিছুটা সরীসৃপের মতো। আকারে এরা হতো বিরাট বিরাট, প্রায় ৪০ ফুটের মতো। এরা মূলত পানিতে থাকলেও যখন তখন ডাঙাতেও উঠে আসত। এদের দেহ ছিল মাছের মতো। তাতে চারটে বিরাট বিরাট পাখনা। আবার মুখ ছিল কুমীরের মতো লম্বাটে। তাতে করাতের মতো দাঁত। মনে হয় এরা অত্যন্ত হিংস্র ছিল। এই রকম একটা ইকথিয়সরাসের কঙ্কালের মধ্যে অনেকগুলো বাচ্চা ইথয়সরাসের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তাতে কেউ কেউ বলেন যে ক্ষিদে পেলে এরা নিজের বাচ্চাকেও ছেড়ে দিত না। আবার একদল বলে যে না, ওগুলো ওর পেটের বাচ্চা। মরবার সময় বাচ্চাগুলো ছিল পেটে। কিন্তু তাতে আর এক সমস্যা দেখা দেয়– ইকথিয়সরাস কি মাছ কুমীর প্রভৃতির মতো ডিম পাড়ত না– সরাসরি বাচ্চা দিত?

এদের চোখও ছিল খুব অদ্ভূত। দরকার মতো এরা চোখ দিয়ে দুরবীণ আর অনুবীক্ষণের কাজ চালাতে পারত। কাজেই বলা যেতে পারে যে এই প্রাণী একসময় সমুদ্রের বিভীষিকা ছিল। Plisiorus, মোসাসরাস এরাও এই যুগের প্রাণী। হিংস্রতায় বা আকৃতিতে এরাও ইকথিয়সরাসের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। তবে এই যুগের আর এক প্রাণী ডাইক্লোডোকাস কিন্তু একদমই নিরহী ছিল। তবে চেহারায় এরা হতো আরো বড়। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭৫ ফুট। ওজনে ২৫ টন।

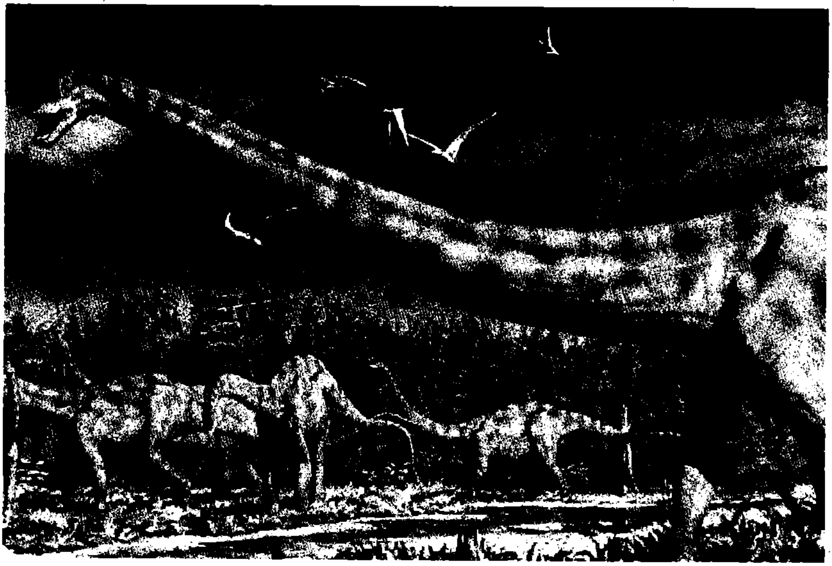

www.pathagar.com

এরা ছির নিরামিষী। আর এদের মাথা খুব ছোট ছিল। তাই বলা যায় যে এদের বুদ্ধি বিশেষ ছিল না।

ক্রমশ এসে গেল সরীসৃপ যুগ। জলজ প্রাণী থেকে অ্যামফিবিয়াস ও তারপরে সরীসৃপেরা এল। স্থলভাগের পুরোপুরি মালিকানা নিয়ে নিল এই সরীসৃপেরা। এই সব আদিযুগের সরীসৃপেরা আজকের টিকটিকি, গিরগিটির জাতভাই হলে কি হবে, চেহারায় এরা ছিল বিপুলাকার। এদেরকে ডাইনোসর বলা হয়। এখন পর্যন্ত যে সব অসিল পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে এরা দৈর্ঘ্যে প্রায় নব্বই ফুট পর্যন্তও হতো। আর উচ্চতায় প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান। এরা নিরামিষাশী মাংসাশী দুই ধরনেরই হতো। কেউ কেউ চার পায়ে চলত আবার কারো সামনের পা দুটো হতো ছোট। ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হতো তাদের।

ইগুয়ানোডন, মেনালোসরাস্, ব্রন্টোসরাস, সির‍্যাটোসরাস, সিটিওসরাস প্রভৃতি ডাইনোসরেরা ভয়ংকর রকমের হিংস্র হতো। তবে তুলনামূলক ভাবে এরা

তৃণভোজী ডাইনোসরদের থেকে ছোট হতো। কিন্তু দৌড়ঝাপে এরা তৃণভোজীদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। ইগুয়ানোডনের দাঁত ও নখে অসিল দেখে বিজ্ঞানীরা প্রথমে ওদের শিং বলে ভুল করেছিলেন। কাজেই আন্দাজ করা যায় কি বিশাল চেহারার হতো এরা সব।

www.pathagar.com

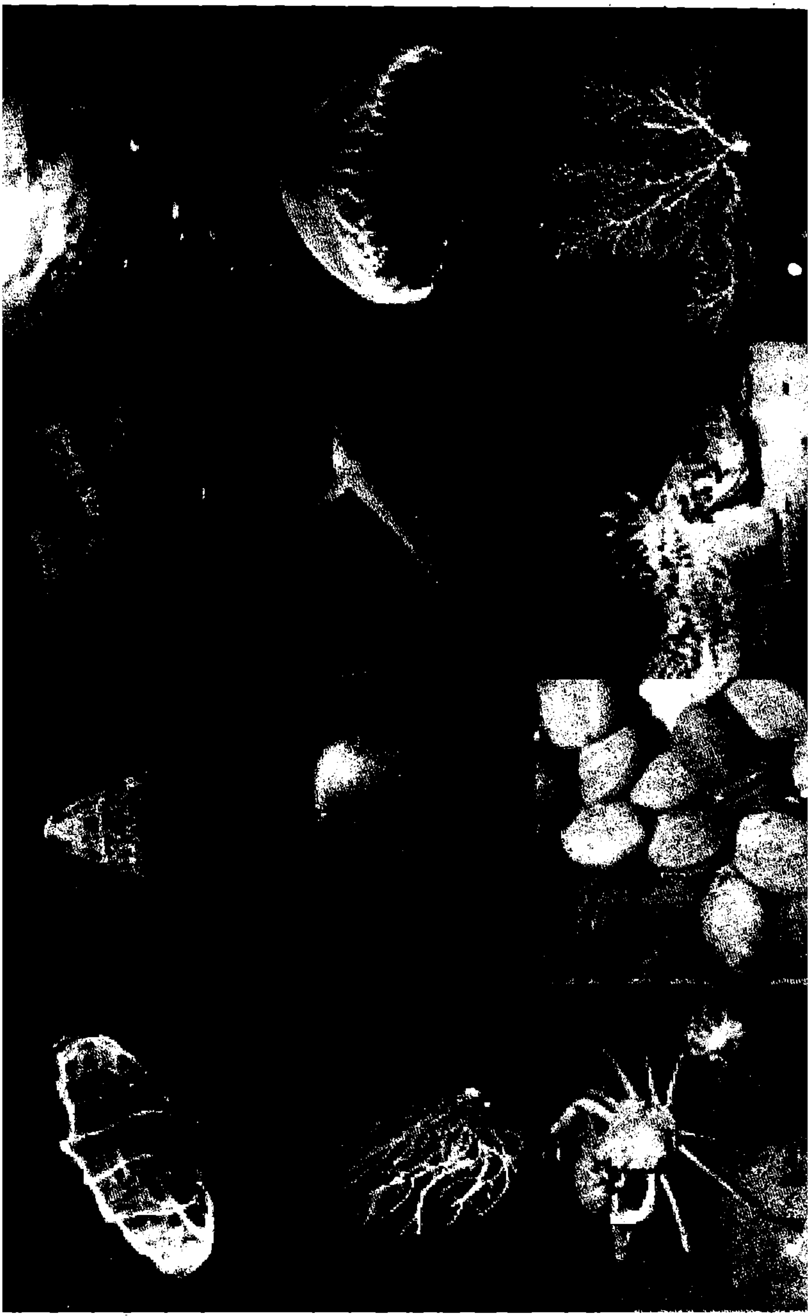

www.pathagar.com

যাহোক, এসব প্রাণীজগতের কথা। এসব কথা এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমরা জানতে চাই সাগর তলের রহস্যময় জগতের কথা। প্রাণীজগতের রহস্যময়তা নিয়ে আমার আর একটি বই আছে। এদের সম্পর্কে বেশিকিছু জানতে চাইলে তোমরা সেই বইটি পড়ে নাও।

সমুদ্রের পানি রাশি

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীতে মোট ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার পানি আছে। পৃথিবীর উপরিতলের মোট আয়তন ৫১ কোটি ৯ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৩৫ কোটি ১২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে এই পানি। অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিতলের ১০০ ভাগের প্রায় ৭২ ভাগই পানিতে ঢাকা। এই পানির পরিমাণ প্রায় ১৩০ কোটি ঘন কিলোমিটারের মত। বাকি পানির বেশির ভাগটাই রয়েছে গ্রীণল্যাণ্ড ও মেরুদেশের বরফে। মাটির জলায়,হ্রদ-পুকুর-নদী-নালা-খাল-বিল এবং আকাশে জলীয় বাষ্প রূপে যা পানি আছে তার মোট পরিমাণ ১ ভাগও নয়। অর্থাৎ এক কথায় পৃথিবীতে যা পানি আছে তার ৯৭ ভাগই রয়েছে সমুদ্রে। সুতরাং এদিক থেকেও আমরা দেখছি, পানি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সমুদ্রের কথা এসে পড়বেই।

এমনিতে সমুদ্রের গড় গভীরতা হচ্ছে ৩,৮০০ মিটারের মত। কিন্তু কোন কোন জায়গায় এই গভীরতা আরো বেশি। তবে সবচেয়ে গভীর প্রশান্ত

www.pathagar.com

মহাসাগরের মারিয়ানাস ট্রেঞ্চ এলাকা (১১,০৪০)। এছাড়া ৮৯০০০ মিটার গভীর এলাকা সমুদ্রের অনেক জায়গাতেই আছে।

সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে স্থলভাগের গড় উচ্চতা ৭০০ মিটারের মত। পৃথিবীর উপরিতল এইভাবে উঁচু নিচু না হলে সমুদ্রের সৃষ্টি হত না। ফলে সারা পৃথিবী

জুড়ে সমস্ত পানি সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ত। পৃথিবী হত পানিতে ঢাকা বিচিত্র একটি গ্রহ। হিসেব করে দেখা গেছে, এই অবস্থায় সম্পূর্ণ পৃথিবী প্রায় আড়াই হাজার মিটার গভীর পানির তলায় চলে যেত।

সমুদ্রের পানিতে পৃথিবীর প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল এ কথা আগেই বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এখনও ডাঙার বুকে যত না জীব বাস করে, তার সহস্র গুণ বাস করে সমুদ্রের নিচে। আর রয়েছে কোটি কোটি টন সবুজ শ্যাওলা। বাতাসে অক্সিজেন তৈরিতে যাদের ভূমিকা অপরিসীম।

এছাড়াও সমুদ্রে রয়েছে বহু রকমের খনিজ পদার্থ। লবণের কথা তো আমরা জানিই। অন্যান্য যে সব খনিজ আছে, তার মধ্যে প্রথম হল ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, নিকেল, কোবাল্ট, তামা, সীসা, সোনা ও রূপা।

কোন কোন মৌলিক পদার্থ আবার ডাঙার চেয়ে সমুদ্রেই রয়েছে বেশি পরিমাণে। যেমন ইউরেনিয়াম। ডাঙার তুলনায় এই অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক

www.pathagar.com

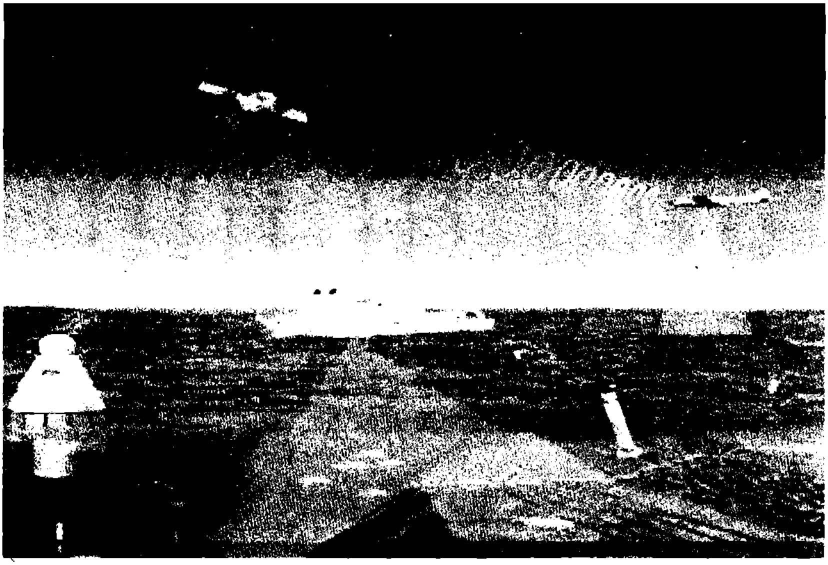

www.pathagar.com

পদার্থটি সমুদ্রে রয়েছে প্রায় ১০০০ গুণ বেশি। বিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্রে যা ইউরেনিয়াম আছে তার শতকরা এক ভাগও যদি সমুদ্র থেকে তোলা যায়, তা দিয়ে সারা পৃথিবীর ৩০০ বছরের জ্বালানী খরচ চলে যাবে।

পৃথিবীর আবহমন্ডল ও সমুদ্র

বুধ বা চাঁদের মত না হলেও পৃথিবীতেও তাপমাত্রার চরম হেরফের হতে পারত। কিন্তু তা হয় না। খুব বেশি হলেও পৃথিবীর তাপমাত্রার হেরফের ৩০ থেকে ৪০ ডিগ্রির মধ্যেই থাকে। তাও সব জায়গায় নয়। বেশির ভাগ জায়গায়–বিশেষ করে বাংলাদেশ সহ আশেপাশের কয়েকটি দেশে হেরফের হয় আরো কম।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলের ক্ষেত্রেও সমুদ্রের ভূমিকা কম নয়। চাঁদের কথাই ধরা যাক। চাঁদে দিনের বেলায় তাপমাত্রা থাকে ১৫০ ডিগ্রি সেন্ট্রিগেড। রাতে ঐ তাপমাত্রা নেমে আসে শূন্যের নিচে ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তার মানে দিনে আর রাতে তাপমাত্রার আকাশ পাতাল তফাৎ। বুধের অবস্থা আরো করুণ। সেখানে দিন রাতে তাপমাত্রার হেরফের হয় কয়েকশো ডিগ্রির মত।

www.pathagar.com

আবহাওয়ার এই সুস্থির অবস্থার জন্য দায়ী সমুদ্র। পৃথিবীর গতি, চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণ ইত্যাদির জন্য সমুদ্রের পানিতে সবসময় একাধিক স্রোত আছে। এই স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিষুব অঞ্চল থেকে আগত মেরু প্রদেশের স্রোত।

বিষুব অঞ্চল সূর্যের তাপ বেশি পায়। ফলে এই অঞ্চলের সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয়ে ফুলে ওঠে। ফুলে ওঠা এই পানি মেরুপ্রদেশের দিকে চলতে থাকে। আর মেরুপ্রদেশ থেকে শীতল পানির স্রোত বিষুব অঞ্চলের দিকে সরে আসে। ব্যাপারটা অনেকটা মোটর গাড়ির রেডিয়েটারের মত। রেডিয়েটারে পানি ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। একবার গরম হয়ে পরক্ষণেই আবার শীতল হয়। এইভাবে ইঞ্জিনের উত্তাপ নির্দিষ্ট একটা সীমার মধ্যে বেঁধে রাখে। পৃথিবীর ক্ষেত্রেও সমুদ্রর ভূমিকা অনেকটা এই রকম।

সমুদ্র তলের জগৎ

সমুদ্রের তলদেশটা কেমন– এই নিয়ে এক সময় মানুষের জল্পনা কল্পনার অন্ত ছিল না। বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক জুল ভার্নে কল্পনার চোখে সমুদ্রের তলদেশের যে ছবি এঁকেছিলেন তাঁর অমর উপন্যাস 'টেয়েণ্টি থাউজ্যান্ড লীগ্স আন্ডার দি সী 'উপন্যাসে' তা এক কথায় অনবদ্য। কিন্তু আসল সমুদ্রের তলা

www.pathagar.com

তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আরও কিছু বলা হবে। এখানে আমরা শুধু সমুদ্রের গড়ন নিয়েই আলোচনা করব। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধারনা ছিল, ডাঙার মত সমুদ্রের তলদেশও উঁচু নিচু, খানা খন্দে ভরা। কিন্তু জানা গেছে সেই ধারনা ভুল। সমুদ্রে গভীর খাত, গিরিশিরা, এ সব থাকলেও সমুদ্রের তলদেশ প্রায় সমতল হয়ে গেছে। এ কথাও সত্যি যে, সেই পলল ভেদ করেও বহু পাহাড়, পর্বত, আগ্নেয়গিরি ও গিরিশিরা মাথাউঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের তলদেশকে গড়ন অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন মহীসোপান, মহীঢাল, ও অতল সমভূমি।

মহাদেশের যে অংশ সমুদ্রের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে তাকেই মহীসোপান বলে। এর বিস্তৃতি কোথাও কুড়ি মাইল কোথাও আবার সাতশো মাইলেরও বেশি। আসলে মহীসোপান মহাদেশেরই একটা অংশ। বহু বছর আগে এই অংশ হয়ত শুকনো ডাঙাই ছিল, কালক্রমে সমুদ্র গ্রাস করেছে। তাই এই অংশের গভীরতাও কম। ১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে।

মহীসোপানের পর শুরু হচ্ছে মহীঢাল। সাধারণত দেখা যায় মহীসোপান এলাকার মধ্যে মাইল প্রতি ১৬ থেকে ২০ ফুট করে সমুদ্রের গভীরতা বেড়ে যায়।

www.pathagar.com

এই ব্যাপারটা বেশ কিছু দূর অবধি চলে। তারপরই একলাফে গভীরতা বেড়ে ২০০ থেকে ৩০০ ফুট দাঁড়ায়। কখনও কখনও তা আরো বেশি। সাগরের এই অংশকেই বলে মহীঢাল। এর পরের অংশ অতল সমভূমি। মহাসাগরের একেবারে তলদেশ। এখানে আগ্নেয়গিরি, পাহাড়, ফাটল সবই আছে। আর আছে দীর্ঘ বিস্তৃত কয়েকটি গিরিশিরা ও গভীর খাদ।

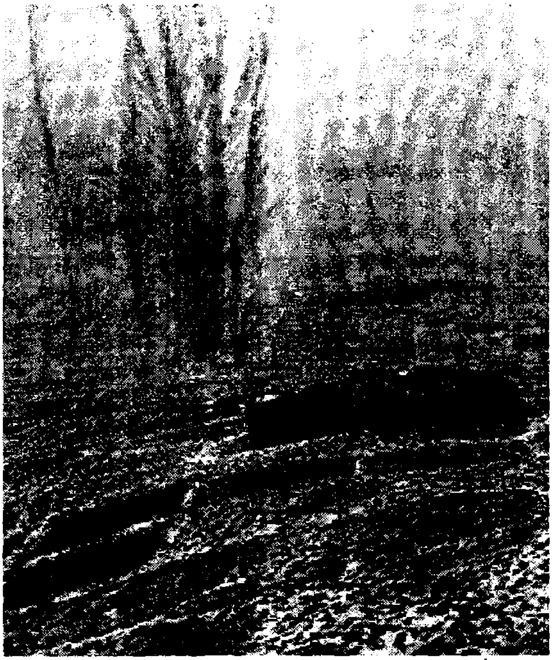

www.pathagar.com

গভীর সমুদ্রের কথা

এই সমুদ্রের বুকে কত কি যে পাওয়া যায় তা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, সোনা, রূপো তামা প্রভৃতি ধাতু; ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ সবই এই সাগরে পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রবাল আর মুক্তোর মত মূল্যবান রত্নও সমুদ্রে পাওয়া যায়। এই প্রবাল জন্মায় এক রকম পোকার শরীর থেকে, আর মুক্তো জন্মায় এক রকম ঝিনুকের পেটে।

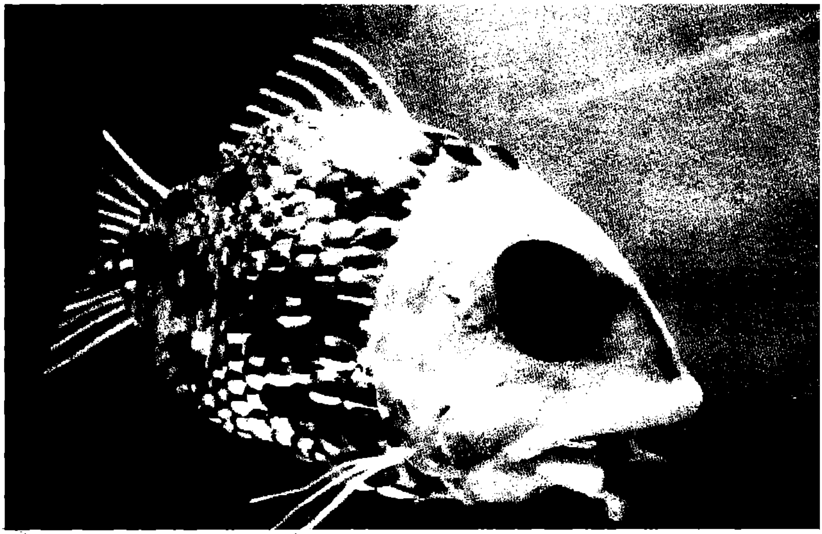

সেই কারণেই সমুদ্রকে বলা হয় রত্নকর। তবে এর বেশীরভাগই সংগ্রহ করা ভীষণ ব্যয়সাপেক্ষ। যেমন ধর প্রতি ঘন মাইল সমুদ্রের পানিতে সোনা আছে প্রায় ১৭ কিলোগ্রাম। কিন্তু ঐ এক ঘন মাইল সাগর ছেঁচে ১৭ কিলো সোনা তুলতে যে খরচ পড়বে তা এই সোনার দামের চেয়ে অনেক বেশী।

সুবিশাল সমুদ্র

এই সমুদ্র যে কি বিরাট তা সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় সমুদ্র একটাই, আর ডাঙা জমিগুলো তার এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। সব শুদ্ধ ডাঙা হচ্ছে মোটামুটি ১৫ কোটি বর্গকিলোমিটার আর পৃথিবীর প্রায় ৭৬ কোটি বর্গকিলোমিটার জুড়ে আছে পানি। অর্থাৎ পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ জুড়ে আছে সমুদ্র।

www.pathagar.com

বিরাট এই জলরাশিকে পাঁচটি মহাসাগরে ভাগ করা হয়েছে। প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু মহাসাগর। এদের মধ্যে

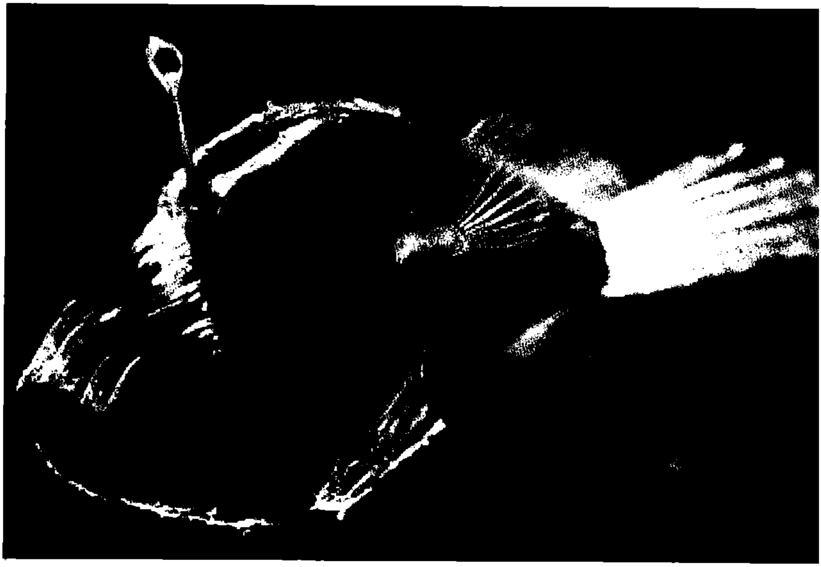

আয়তনে সবচেয়ে বড় প্রশান্ত মহাসাগর– ২৬ কোটি ৪০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। ভারত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর আয়তনের দিক থেকে প্রায় সমান। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু মহাসাগর সবচেয়ে ছোট। সব মিলিয়ে মহাসাগরগুলিতে পানির পরিমাণ ৩৫ কোটি ঘন মাইলের মত। এই সমুদ্রের বুকে কত কি যে পাওয়া যায় তা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, সোনা, রূপো, তামা প্রভৃতি ধাতু। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ সবই এই সাগরে পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রবাল আর মুক্তোর মত মূল্যবান রত্নও সমুদ্রে পাওয়া যায়। এই প্রবাল জন্মায় এক রকম পোকার শরীর থেকে, আর মুক্তো জন্মায় এক রকম ঝিনুকের পেটে।

সেই কারণে সমুদ্রকে বলা হয় রত্নাকর। তবে এর বেশীরভাগই সংগ্রহ করা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ। যেমন ধর প্রতি ঘন মাইল সাগরের পানিতে সোনা আছে প্রায় ১৭ কিলোগ্রাম। কিন্তু ঐ এক ঘন মাইল সাগর ছেঁচে ১৭ কিলো সোনা তুলতে যে খরচ পড়বে তা এই সোনার দামের চেয়ে অনেক বেশী।

www.pathagar.com

সমুদ্রের গভীরতা

ডাঙার কাছাকাছি থেকে সমুদ্র ৬০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত ক্রমে ঢালু হতে হতে এগিয়েছে। তারপরই গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০০ ফুট পর্যন্ত। ডাইভিং স্যুট ছাড়া ডুবরীরা সমুদ্রের ১০০ থেকে ১৫০ ফুট পর্যন্ত নীচে নামতে পারে। আর

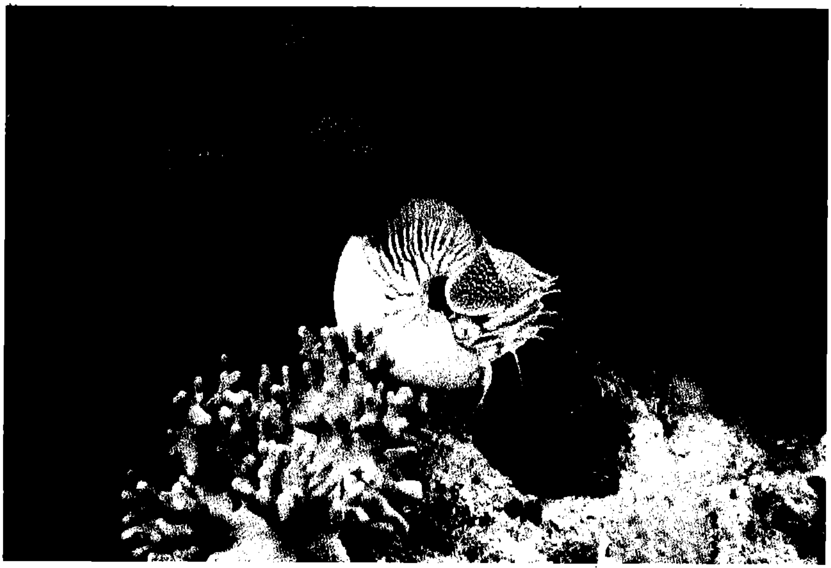

ডাইভিং স্যুট অর্থাৎ বিশেষ ধরনের পোশাক ও অক্সিজেন যোগান দেওয়া নলের সাহায্যে সমুদ্রের অনেক গভীরে ডুবুরী নামতে পারে। সমুদ্রের গভীরতা সবচেয়ে বেশী প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়াম দ্বীপের ৩২১ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে দ্য মেরিয়ানাম ট্রেঞ্চে। এখানকার গভীরতা ৩৫,৮০০ ফুট।

তাহলেই বুঝতে পারছ আমাদের পৃথিবীতে সবচাইতে উঁচু হিমালয়ের যে এভারেষ্ট শৃঙ্গ (২৯,০২৮ ফুট) সেটাও এখানে তলিয়ে যাবে। এছাড়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আর জাপানের মিন্ডানাও-এর কাছে সমুদ্রের গভীরতা ৩৫,৪০০ ফুট তবে সমুদ্রের গভীরতা গড়ে ১২০০ ফুট। প্রসঙ্গত জানাই, বহু বিশেষজ্ঞের ধারণা হিমালয় একসময় প্রশান্ত মহাসাগরেই নিমজ্জিত ছিল। কোন এক সময়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিরাট হিমালয়ের স্থানচ্যুতি হওয়ার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর পণ্ডিতরা সমুদ্রের গভীরতা মাপার জন্যে এক রকম যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, সেই যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের কোন জায়গায় শব্দ করলে তার প্রতিধ্বনি

www.pathagar.com

সমুদ্রের তলায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। শব্দটা সমুদ্রের তলদেশে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে ঐ যন্ত্রের কাঁটা তা নির্দেশ করে। কাঁটা নির্দেশিত সময়কে দুই দিয়ে ভাগ করলে শব্দের যাওয়ার সময় পাওয়া যায়। এখন পানির নীচে শব্দের গতি সেকেন্ডে ৪৭০০ ফুট। সুতরাং এর পরে সমুদ্রের গভীরতা মেপে নিতে অসুবিধা কোথায়।

বরফের জগৎ

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু থেকে মাঝে মাঝেই বিরাট বিরাট বরফের চাঁই সমুদ্রে ভেসে আসে। এই বরফের চাঁইকে বলে হিমশৈল। হিমশৈল অর্থাৎ বরফের পাহাড়। এই হিমশৈল সময়ে সময়ে ৪৮ কি.মি. দীর্ঘ হয় কিংবা সাত মাইল লম্বা, ৩ মাইল চওড়া আর ৬০ ফুট উঁচু হয়। এমন কি ৪০০ ফুট উঁচু হিমশৈলও দেখা গিয়েছে।

হিমশৈলের যতটা অংশ পানির উপর জেগে থাকে, তার আটগুণ থাকে পানির তলায়। হিমশৈল গলতে শুরু করলে উল্টে যায়। তাতে জাহাজের ক্ষতি হতে পারে এবং এইজন্য জাহাজকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। বিরাট বিরাট এই হিমশৈল বা বরফের পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বহু জাহাজডুবি হয়েছে। ১৯১২ সালে ইংল্যান্ডের তৈরি ১০০০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৬৪ ফুট উঁচু বিরাট জাহাজ

www.pathagar.com

'টাইটানিক' এই হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েই ডুবে যায়। সূর্যের আলো ছাড়া গাছ বাঁচে না, সুতরাং সূর্যের আলো সমুদ্রের ভিতর যতদূর যায়, ততদূরই গাছপালা হয়। এই গাছ যে সব মাছের খাদ্য তারা ঐ গাছের কাছাকাছিই থাকে। আবার সেই মাছ যে সব মাছেদের খাদ্য তারাও থাকে ওদেরই আশেপাশে। তাই বলা যায় সমুদ্রের বেশীরভাগ জীবই মোটামুটি উপরের দিকেই থাকে।

সমুদ্রের মুক্তো

সমুদ্রের গভীর তলদেশে শুক্তি নামে একরকম ঝিনুকের পেটে মিহি এককণা বালি ঢুকে গেলে ঝিনুকের দেহ থেকে বেরুনো এক রকম রস ঐ বালু কণাকে

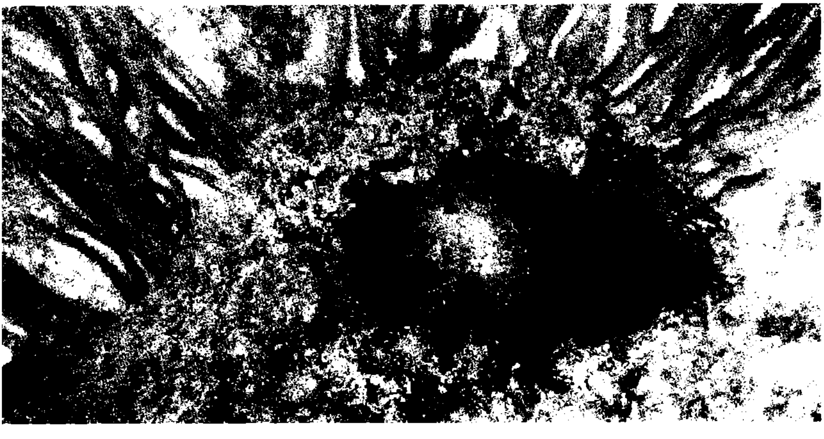

www.pathagar.com

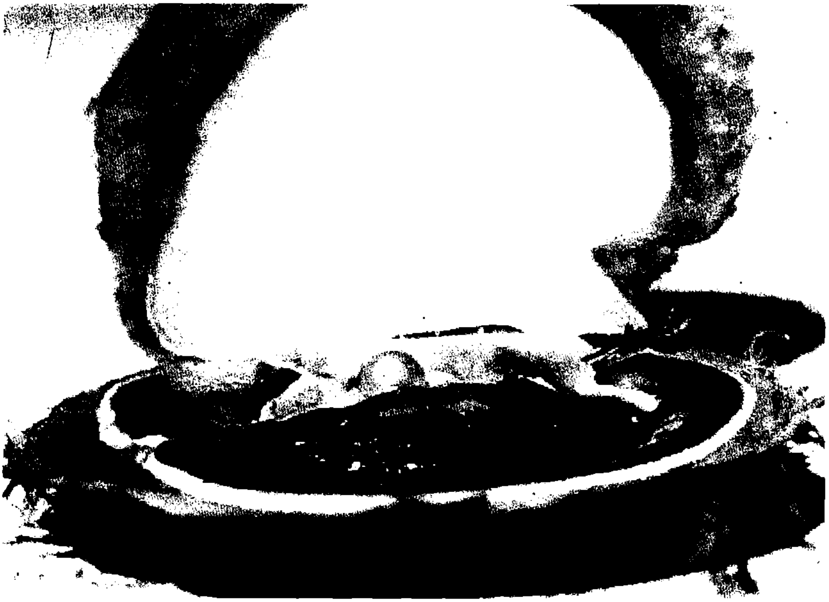

ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলে কঠিন হয়ে যায়। আর প্রায় গোল হয়ে যাওয়া এই জিনিসটিই মুক্তো।

সাদা মুক্তোর চেয়ে গোলাপী বা কালো মুক্তোর দাম অনেক বেশী। প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েক জায়গায় কখনও কখনও কালো মুক্তো পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সাদা মুক্তো ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগরের শ্রীলঙ্কার কাছে আর প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের আশেপাশে পাওয়া যায়। আজ পর্যন্ত যত মুক্তো পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে দশ তোলা ওজনের 'বেরেসফোর্ড-হোপ' হচ্ছে সবচেয়ে দামী মুক্তো। এটি আছে লন্ডনে।

www.pathagar.com

বিচিত্র সামুদ্রিক প্রাণী

সমুদ্রের এবং পানির সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় ভাগীদার হচ্ছে মাছেরা। মানুষের খাবার হিসেবেও মাছের চাহিদা বড় কম নয়। আর খাদ্য হিসেবে মাছেরা কম পুষ্টিকর নয়। নানা ধরনের ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-ডি এবং প্রোটিন, আয়োডিন ফস্ফরাস প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান মাছের থেকে আমরা পাই। মিঠে পানির নদী, বা খাল-বিল, পুকুরের প্রায় সব প্রজাতির মাছ মানুষের খাদ্য হলেও কিন্তু খাদ্য হিসেবে বেশীর ভাগটাই আসে সমুদ্র থেকে। প্রতি বছরে কোটি কোটি টন মাছ সমুদ্র থেকে ধরা হয় মানুষের খাদ্য হিসেবে। তবে সমুদ্রের বেশীর ভাগ

www.pathagar.com

প্রজাতিই কিন্তু মানুষের খাদ্য নয়। হেরিং, কড্ সার্ভিন, ব্লুফিস স্যামান প্রভৃতি মাছ মানুষের খাদ্য তবে কিছু কিছু প্রজাতির হাঙ্গর প্রভৃতি মাছও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়।

মাছেদের দেহ থেকে বোঝা যায় যে এরা পানিতে থাকার জন্যই তৈরী হয়েছে। এদের লম্বাটে শরীর, মাঝখানে চওড়া আর দুদিকে ক্রমশ সরু এবং চ্যাপ্টা হওয়ার জন্য এরা বেশ দ্রুত বেগে পানির মধ্যে চলাফেরা করতে পারে।

www.pathagar.com

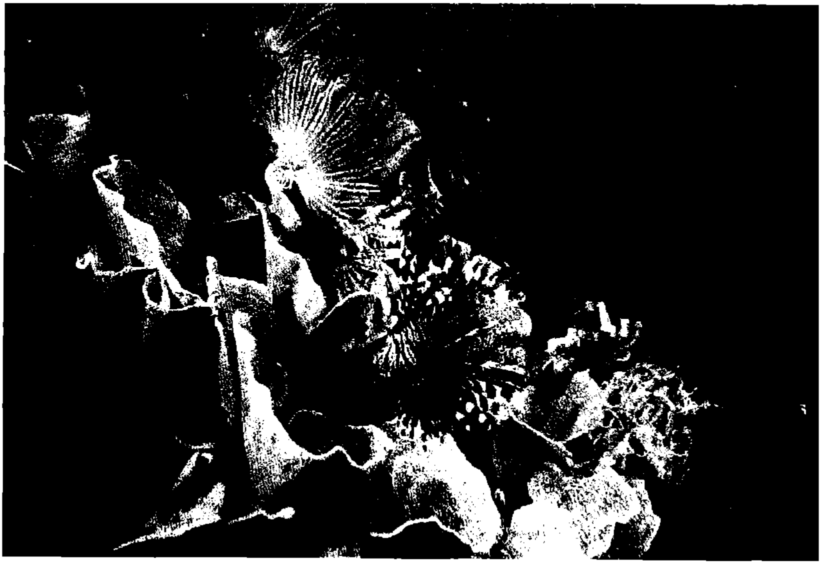

দুটো চোখ মাথার দুপাশে বসানো, যার ফলে এরা দুদিকেই দেখে চলতে পারে পানির মধ্যে সাঁতার কাটার জন্য এদের দুজোড়া পাখনা বা ফিন থাকে দুপাশে ও পেটের নিচে। মাছেদের লেজ চলার সময় হালের কাজ করে– এর দ্বারাই এদিক ওদিক বাঁকতে পারে। তা ছাড়া এদের গায়ে আঁশ বসানো, যা কিনা বর্ষাতির কাজ করে। মাছ নিঃশ্বাস নেয় কানকোর সাহায্যে তাই এরা পানির মধ্যে ছাড়া থাকতে পারে না।

কিছু কিছু প্রজাতির মাছ যাদের লাংফিস বা ফুসফুসওয়ালা মাছ বলে তাদের কানকোর সাথে ফুসফুস থাকার জন্য তারা বাতাস থেকেও অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে। ঈল প্রজাতির মাছেরা তাদের শরীরের সাথে লেগে থাকা পানি থেকেই অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে। কাজেই এরা ডাঙ্গার উপর ভেজা শরীর নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তবে দেহের পানি শুকিয়ে গেলে এদের আর শ্বাস নেওয়া সম্ভব হয় না ফলে মারা যেতে পারে।

www.pathagar.com

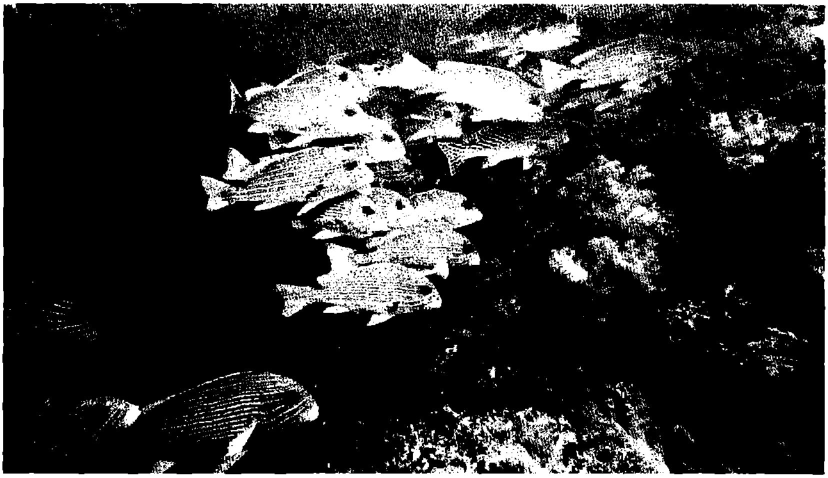

মাছের শরীরের হাওয়া ভরা পটকা কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করে। পানির গভীরে যাওয়া বা পানির উপরে আসা এই পটকার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পটকায় হাওয়ার পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় এদের শরীর তত ফুলে ওঠে ও হালকা হয়ে যায় ফলে এরা ক্রমশ পানির উপরে ওঠে আসে। অন্যদিকে পটকায় হাওয়ার পরিমাণ যত কম হয় এদের দেহের ওজন আকৃতির তুলনায় তত কম হয়ে থাকে ফলে এরা ক্রমশ পানির নীচের দিকে নেমে যেতে থাকে। মাছ পটকাতে ইচ্ছামতো এই হাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়ে পানির উপরে বা নীচে যায়।

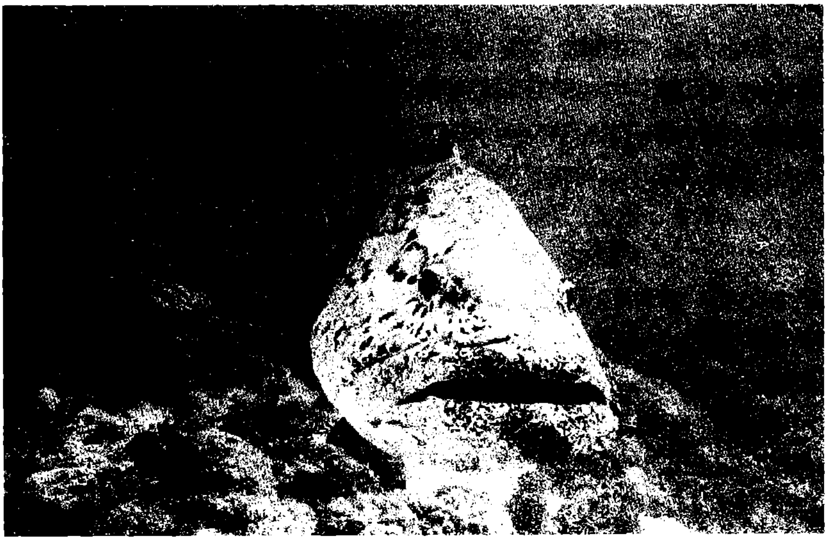

www.pathagar.com

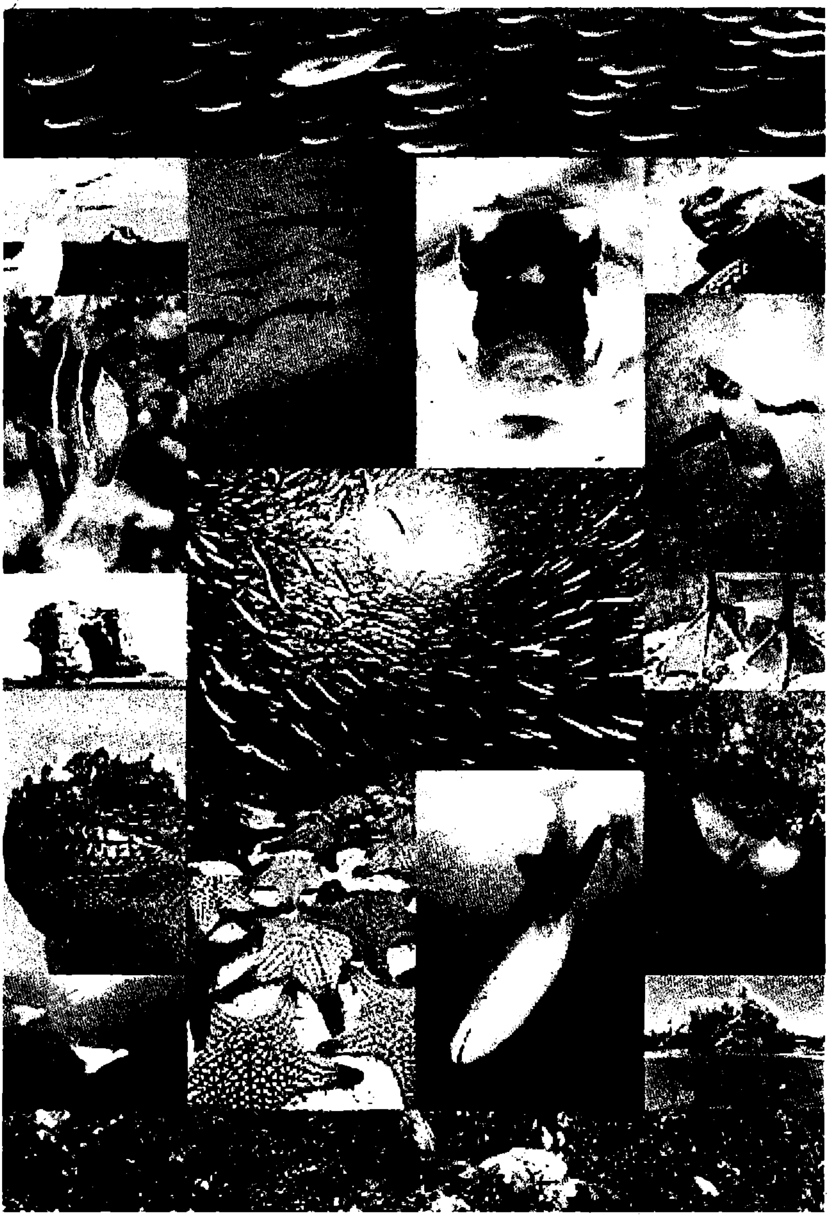

সমুদ্রের তলায় একেবারে উপর দিকের পানির বেশীর ভাগ প্রাণীর খাদ্য হলো এক ধরনের ছোট্ট মাছ। এদেরকে বলা হয় Plangton। এই Plangton ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। খালি চোখে এদের দেখতেই পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

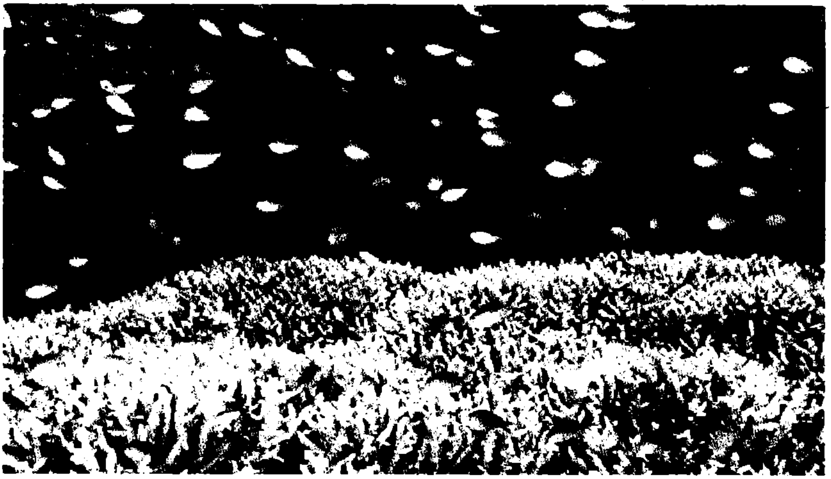

ঝাঁক ঝাঁক এই Plangton-এর মধ্যে থাকে কাঁকড়া, চিংড়ি, জেলি ফিশ প্রভৃতি নানা জাতের প্রাণী, তাদের ডিম, তাদের বাচ্চা প্রভৃতি, আর তার সঙ্গে থাকে লাখে লাখে উদ্ভিদের কণা। এই সব মিলেই হয় Plangton।

পানির বেশীরভাগ প্রাণীই এক একবারে হাজারে হাজারে ডিম পাড়ে। রিং নামের এক রকম মাছ এক একবারে ডিম পাড়ে ২ থেকে আড়াই কোটি, কড মাছ ডিম পাড়ে ৭০/৮০ লক্ষ, হেরিং ৫০/৬০ হাজার, ইলিশ ১৫/২০ লক্ষ, শুক্তি পাড়ে ৭/৮ কোটি। এই সব ডিমের অধিকাংশই চলে যায় অন্যান্য মাছেদের পেটে,

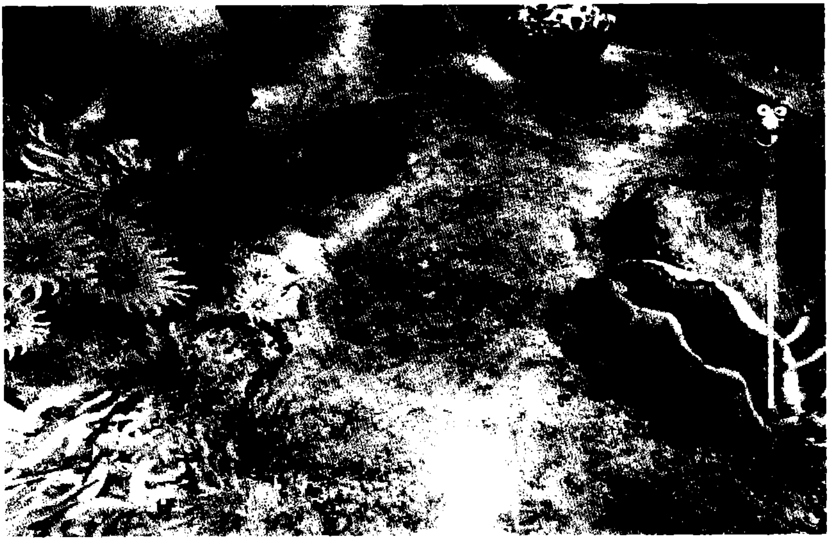

www.pathagar.com

তারপর ডিম থেকে বেরুনো শুককীট তাও চলে যায়, আর এই কারণেই সমুদ্রটা বিভিন্ন মাছ ও প্রাণীর ডিম ও বাচ্চায় ভরে যাচ্ছে না।

চোখে দেখা যায় না এমন নানা জাতের এককোষী উদ্ভিদ সমুদ্রে আছে। এ ছাড়া শেওলা ও ঘাস জাতীয়, যে সব উদ্ভিদ আছে তাদের কেউ ফিকে সবুজ, কেউ ঘন সবুজ, কেউ বা ঘন মেটে রঙের। খুব নীচের দিকে বেগুনী রঙের উদ্ভিদ, এমন কি লাল শেওলাও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া আছে পামগাছের মত হাতখানেক উঁচু এবং ব্যাঙের ছাতার মতো গাছ। এ সব ছাড়া আরও কত যে বিচিত্র বর্ণের ও জাতির উদ্ভিদ সমুদ্রের তলদেশে আছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

এবার সামুদ্রিক প্রাণীর কথা। সমুদ্রের পানিতে যেমন ঝিনুকে, শামুক, কাঁকড়া জাতীয় শক্ত খোলসের ছোট ছোট জীব আছে, তেমনি কাদার মতো নরম জেলিফিশ, তারা মাছ আর পাঁচ-সাত মণ ওজনের বিরাট বিরাট মাছও আছে। এছাড়া ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা তিমি, শার্ক, হাঙ্গর, উড়ুক্কু মাছ, অক্টোপাস বিদ্যুতের মত শক্ মারা ইল মাছও আছে।

মাছ জাতীয় পাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে, ৬৫/৭০ ফুট লম্বা হোয়েল শার্ক। এদের মুখটা ব্যাঙের মতো বীভৎস আর খয়েরী গায়ে থাকে সাদা সাদা ছিট ছিট। তিমিকে আমরা মাছ বলি, সেই তিমি কিন্তু মাছ নয়। এদের রক্ত গরম

www.pathagar.com

আর মানুষের মতোই এদের বাচ্চা হয়। বিভিন্ন জাতের তিমির বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য। কোন কোন তিমির ওজন হয় ১০০ টনেরও বেশী, আবার কেউ কেউ হয় লম্বায় ১০০ ফুট। কোন কোন তিমির মুখে দাঁত থাকে, আবার কারও কারও মুখে থাকে কুচি কুচি হাড়ের জাল। এরা একসঙ্গে অনেকখানি পানি মুখে টেনে নিয়ে পানিটা যখন বের করে দেয় তখন ঐ হাড়ের জালিতে ছোটখাটো মাছ ইত্যাদি আটকে যায়। এরা যেহেতু মাছ নয় তাই, ২০-২৫ মিনিটের বেশি পানিতে ডুবে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ সারতে পারে না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রশ্বাস নেওয়া এবং নিঃশ্বাস ছাড়ার জন্য ওপরে উঠে আসে। এরা দম ছাড়লে ফোয়ারার মত পানি ওঠে। নার-হোয়াল নামে ছোট একজাতের তিমি আছে, এদের আবার শুঁড় থাকে।

তরোয়াল মাছের ওপরের শক্ত ঠোঁট লম্বা ও সরু হয়। তারা এই ঠোঁট তরোয়ালের মতো অন্য মাছের দেহে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের মেরে ফেলে।

হাতির মুখের দুপাশে যেমন দুটো দাঁত থাকে তেমনই একজোড়া দাঁত আছে সিন্ধুঘোটকের, এই দাঁত দেড় থেকে দু'ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। সিন্ধুঘোটক অর্থে সমুদ্রের ঘোড়া, কিন্তু এদের মুখের সঙ্গে ঘোড়ার মুখের কোন সাদৃশ্যই নেই। এ ছাড়া আছে সীল, যাদের আমরা সীল মাছ বলি। এরা কিন্তু মাছের পর্যায়ে পড়ে

www.pathagar.com

না, কারণ এরা স্তন্যপায়ী এবং বাচ্চার জন্ম দেয়, এই সীল হয় নানা জাতের। যেমন, সিন্ধু-সিংহ, এদের ঘাড়ে সিংহের কেশরের মতো সামান্য লোম আছে। আর আছে সিন্ধু-হস্তী, এদের মুখে ছোট শুঁড় মতো থাকে। সব রকম সীলেরই পাখনার মত চারটে পা আছে, এর সাহায্যে এরা ডাঙায় ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলতে পারে।

সী-হর্স নামে এক রকম সামুদ্রিক প্রাণী আছে তাদের মুখটা অনেকটা ঘোড়ার মত আর লেজটা কুমিরের মতো। এরা গরম দেশের সমুদ্রে থাকে। ফুটখানেক লম্বা এই-সীহর্সের মায়েরা ডিম পাড়ে আর বাপেরা বুকের থলিতে সেই ডিমগুলিকে রেখে তা দেয়। এরা সমুদ্রের নীচের গাছ-গাছালিতে লেজ আটকে বিশ্রাম করে।

স্পঞ্জ, ঘড়ি, প্রবাল। স্পঞ্জ এক রকম সামুদ্রিক জীবের নরম, ফাঁপা, হালকা, কঙ্কাল। স্পঞ্জের গায়ে অসংখ্য চুটো থাকে। এই ফুটো দিয়ে সাগর পানির সঙ্গে ঢোকা খাদ্যকণা খেয়েই স্পঞ্জ বেঁচে থাকে।

সমুদ্রে একজাতের খুব ছোট পোকার গা থেকে চুনের মতো জিনিস বেরোয়, তাকে খড়ি বা চা-খড়ি বলে। সমুদ্রের তলদেশে বছরের পর বছর এই খড়ি জমে খাঁড়া পাহাড় হয়। আর এক ধরনের ছোট পোকার গা থেকেও চুনের মতো

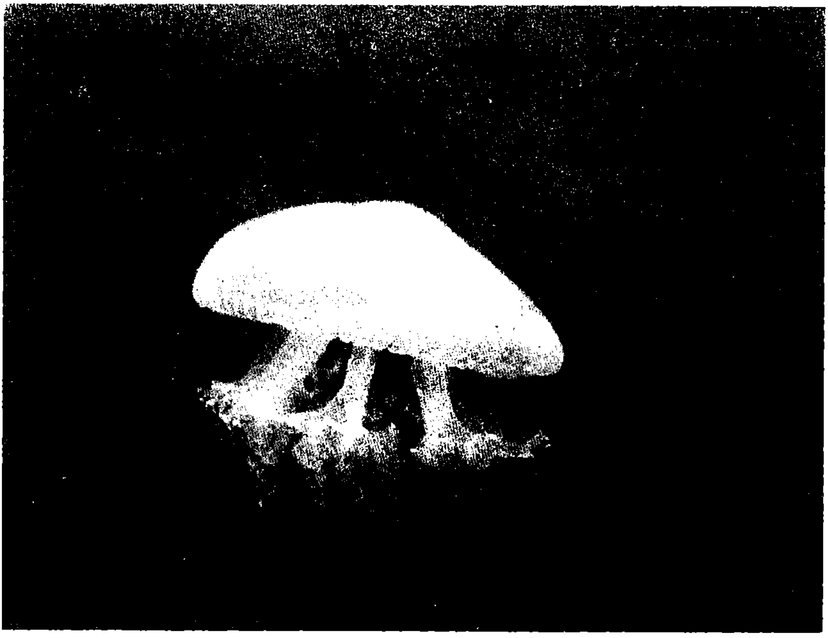

www.pathagar.com

জিনিস বেরিয়ে পাহাড়, দ্বীপ প্রভৃতি গড়ে ওঠে, তাকে বলে প্রবাল। প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য প্রবাল দ্বীপ আছে।

এছাড়া সমুদ্রের গভীরে আর যে সব প্রাণী আছে তাদের কোনটার গা, মাথা কিংবা লেজ থেকে জোনাকির মতো আলো বেরোয়। কারও বা লম্বা শুঁয়ো কিংবা দাড়ির মতো গোঁফের মাথায় বাতি জ্বলে। অপর কারও দাঁতগুলো আলোয় জ্বলজ্বল করে। কুডুলমাছের গায়ের দুপাশে সবুজ আর বেগুনী আলো জ্বলে। ছোট ছোট এক জাতের স্কুইডের গায়ে লাল, ধূসর, নীল আলো ক্রমাগত বদলে চলে। আর যাদের আলো নেই, তাদের চোখও নেই। তাদের পাখনা সরু লম্বা হয়ে ছড়িয়ে থাকে। তাই দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে তারা চলে ফিরে বেড়ায়। এছাড়া একজাতের চিংড়ি আছে যারা মাথায় আচমকা এমন জোরে আলো জ্বেলে দেয় যে শত্রু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পালাতে পারে না, ফলে শিকারে পরিণত হয়।

গভীর সমুদ্রে আছে আর এক জাতীয় মাছ যাদের শয়তান মাছ বলা হয়। সারা মুখ জুড়ে বড় বড় বিশ্রী দাঁত আর বিকট দর্শন মস্ত বড় মাথায় এরা দেখতে অত্যন্ত কদাকার। একটা মেয়ে শয়তান মাছের গায়ে দশ বিশটা পুরুষ শয়তান মাছ লেগে থাকে সব সময়, ফলে ক্রমশ তাদের চোখ, মুখ মাথা মেয়ে মাছটির গায়ের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

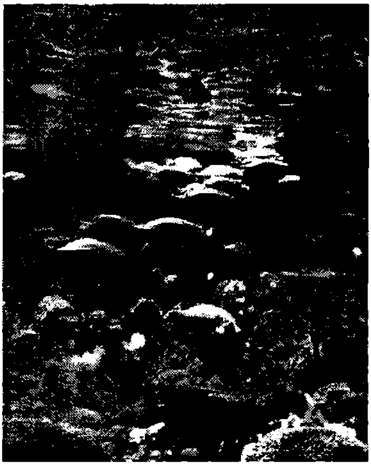

সমুদ্রের আর এক অতি পরিচিত প্রাণী হলো শুশুক বা ডলফিন। পাখির ঠোঁটের মতো লম্বা ঠোঁটওয়ালা এই প্রাণী কিন্তু আদতেই হিংস্র নয়। বরং এরা বেশ আমুদে প্রাণী। দল বেঁধে এরা লাফঝাঁপ আর ডিগবাজি খেয়ে বেশ হৈচৈ করে বাস করে। ডলফিন মানুষের বেশ পোষ মানে। পোষা ডলফিনকে নানারকম খেলাও শেখান হয়। সমুদ্রের ডলফিনরাও আমাদের অনেক উপকারে লাগে। জাহাজের সামনে সামনে এরা পাইলটের মতো পথ দেখিয়ে অনেক সময়েই জাহাজকে পানির তলায় চোরা পাহাড়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যায়। সেইজন্যই নাবিকরা এদের কখনো শিকার করে না। বরং জাহাজ থেকে নানারকম খাবার দেয়।

এরা প্রায় ২৫ বছর বাঁচে। লম্বায় পাঁচ সাড়ে পাঁচ ফুট হয় এবং একটি পুর্ণবয়স্ক শুশুকের ওজন ৪০০-৫০০ কেজি। এরা অনায়াসে ঘণ্টায় ৩০ কি.মি.

www.pathagar.com

বেগে চলতে পারে। সামুদ্রিক প্রাণী হলেও প্রশ্বাস না নিয়ে এরা ৬/৭ মিনিটের বেশী পানির তলায় থাকতে পারে না। আগেই বলেছি, এরা মানুষের বন্ধু। এরা যেমন ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে পারে তেমনই দিগভ্রষ্ট জাহাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই নাবিকরা এদের খুবই ভালবাসে। এদের দেখতে পেলে অজস্র খাদ্য পানিতে ফেলে দেয়। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে এদের মস্তিষ্ক

প্রায় কুকুরের মতই বুদ্ধিদীপ্ত। এ ছাড়া আরও যে কত শত উদ্ভিদ ও প্রাণী সমুদ্রের নীচে আছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

সমুদ্রের গভীরের বেশ কিছু প্রজাতির মাছ মানুষের খাদ্য। আবার অনেক প্রজাতির মাছ যেমন গোল্ডফিস, মলি, আঞ্জলমাছ, সাম্পি প্রভৃতিকে মানুষ বাড়িতে এ্যাকুরিয়ামে পোষে। তবুও কিছু কিছু মাছ আছে যারা মানুষের শত্রু। এই ধরনের মাছের কথা উঠলেই অনিবার্য ভাবে প্রথমেই মনে আসে হাঙরের কথা। এদের দুপাটি দাঁতের জোর এত বেশী যে এরা অনায়াসে একটা মানুষকে কামড়ে দুই টুকরো করে ফেলতে পারে। পানির মধ্যে এরা অনেক দূর থেকে রক্তের গন্ধ পায়। কোন ভাবে শিকারের সন্ধান পেলে এরা তাকে ধরবার জন্য

www.pathagar.com

অনুসরণ করে রাখে। তবে বাস্কির শার্ক, সবচেয়ে বড় জাতের হাঙর হোয়েল শার্ক যা এক একটা পঞ্চাশ ষাট ফুট বড় হয়, বা নার্স শার্করা কিন্তু বেশ নিরীহ

হাঙর, মানুষের কোন ক্ষতি করে না। আসলে ওদের দাঁত এত ছোট হয় যে ছোট ছোট প্রাণী ছাড়া অন্য কিছু এরা খেতে পারে না। আবার নার্স শার্ক এত নিরীহ যে অনেক সময়ই সমুদ্রের সাঁতারুরা এদের পিঠে চেপে বসে। এদের ফ্লোরিডার কাছাকাছি পাওয়া যায় এবং প্রায়শই এরা অগভীর চলে চলে আসে।

দক্ষিণ আমেরিকায় নদীতে এক ধরনের ছোট ছোট মাছ পাওয়া যায় যাদের নাম পিরানহা। এরাও কিন্তু ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির হয়। এদের ঝাঁকে এবার কোন প্রাণী পড়লে আর নিস্তার নেই। দল বেঁধে আক্রমণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে শেষ করে ফেলে। বিশেষ করে পানিতে একবার রক্তের গন্ধ পেলেই হয়। ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসবে সেখানে। আবার ব্যারাকুডা, ওরয়গেস্, প্যারট, মাছেরা বেশ বিষাক্ত হয়। এই সব মাছ খেয়ে অনেকেই বিষক্রিয়ায় মারা গেছে। আবার স্টোনফিশ, লায়নফিস প্রভৃতির কাঁটার আঘাতে বেশ যন্ত্রনাদায়ক ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। তাই সাঁতারুরা সব সময় এদের এড়িয়ে চলে।

www.pathagar.com

তিমির মতোই পানির প্রাণী কিন্তু মাছ নয়– এ রকম আরো কয়েকটা প্রাণী রয়েছে। যেমন শীল। এরাও স্তন্যপায়ী এবং অনেককাল আগে ডাঙ্গার বাসিন্দা ছিল। বড় বড় প্রজাতির সীল লম্বায় পাঁচশ-তিরিশ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। তবে এদের বেশীর ভাগ প্রজাতিই ছোট হয়। এরা সাধারণত পানিতে থাকলে ডাঙ্গাতেও থাকে। তিমির মতো পুরোপুরি পানির বাসিন্দা নয়। সীল পাওয়া যায়

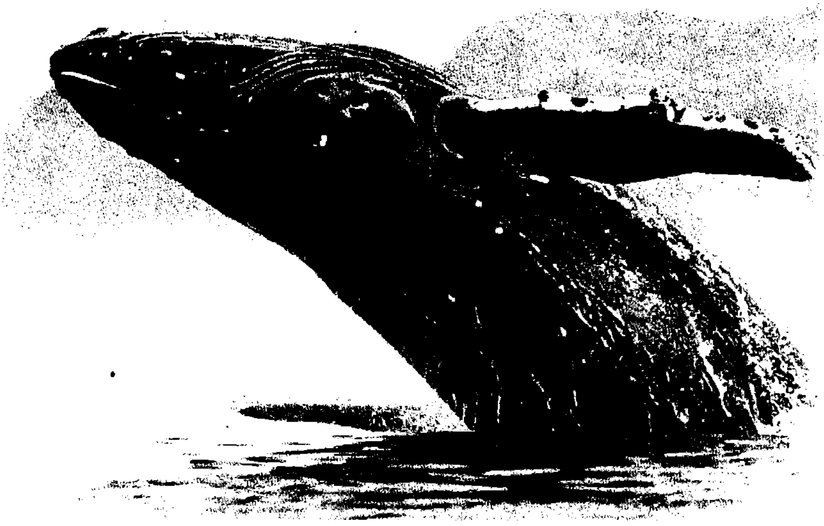

সমুদ্রের একেবারে উত্তরাঞ্চলে আর দক্ষিণে। অর্থাৎ এরা শীতল অঞ্চলের বাসিন্দা। পানিতে সাঁতারের সুবিধার জন্য এদের পেছনের দুপা দুরে গিয়ে লেজের মতো হয়েছে। আবার সামনের দুপা দিয়ে পেছন দিকটা ঘসটে ঘসটে এরা ডাঙ্গার উপর হাঁটাচলা করে।

সিন্ধুঘোটকও এই রকম পানির প্রাণী। সীলের মতো এরাও ডাঙ্গাতে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলতে পারে। এদের নামের সাথে ঘোটক থাকলেও এরা ঘোড়া নয়। আবার সীলও নয়। একেবারেই আলাদা জাতের প্রাণী। এরা আকারে প্রায় পনের ফুটের মতো হয়। আর তেমনি ভারী হয়। এদের বৈশিষ্ট্য হলো উপরের পাটির দুটো দাঁত হাতির মতো সোজা নীচের দিকে নেমে এসেছে। এর দ্বারা এরা শিকারকে গেঁথে তোলে। আবার লড়াই-এর সময় এই দাঁত অস্ত্রের কাজ করে।

www.pathagar.com

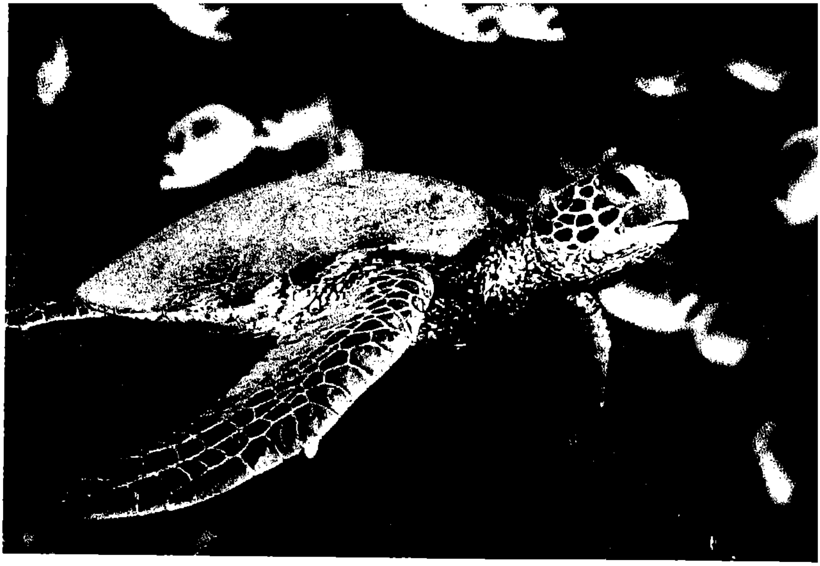

আকৃতিতে ভয়ানক হলেও স্বভাবে তেমন হিংস্র এরা নয়। তবে বাচ্চাকে রক্ষা করার সময় এরা কিন্তু খুব সাহসের পরিচয় দেয়।

প্রাচীনকালের সমুদ্র

ভূতাত্ত্বিকদের মতানুসারে পৃথিবীর ইতিহাসকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়– যথাক্রমে প্রোটোরোজোইক, প্যালিওজোইক, মেসোজোইক ও কেইনোজোইক।

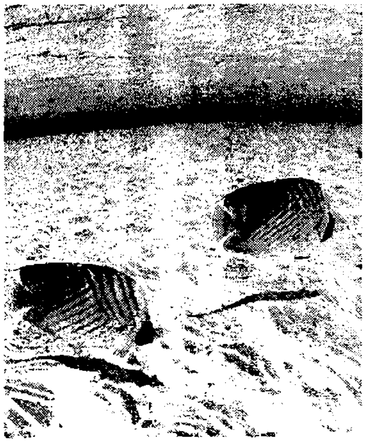

প্রথম যুগ অর্থাৎ প্রোটোরোজোইকে প্রাণের কোন অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয় যুগ প্যালিওজোইকে প্রাণের প্রথম সঞ্চার হয়। তৃতীয় যুগ মেসোজোইকে প্রাণের রূপ মোটামুটি মাধ্যমিক আকার ধারন করেছে। সব শেষের যুগ অর্থাৎ কেইনোজোইক বা সিনোজোইকে আধুনিক প্রাণের সৃষ্টি। অবশ্য এটা মনে রাখা ভাল যে প্রাণ বলতে আমরা এখানে অনুপ্রাণ গাছপালা জীবজন্তু সবকিছুকেই বুঝিয়েছি।

www.pathagar.com

সমুদ্র সৃষ্টির বিভিন্ন পর্ব

আলোচ্য পৃথিবীর প্রত্যেক ভাগেই পৃথিবীর রূপও ছিল ভিন্ন ভিন্ন, আর এই প্রত্যেকটা ভাগকেই আবার কতগুলো উপভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ প্রোটোরোজোইকে কোন ভাগ নেই। এর যুগ পৃথিবীর প্রথম দশ ভাগ,

তখন পৃথিবী গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরল হয়। তারও অনেক পরে পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন আকার ধারন করে। তখনও পৃথিবীর আবহাওয়া মন্ডল ছিল ঘন ও বাষ্পীয়। ক্রমাগত প্রচুর উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ বেরুনোর ফলে মেঘ সৃষ্টি হল। মেঘ থেকে এলো পানি। পানি মানে অবিরাম পানি। ফলে সৃষ্টি হল সমুদ্র আর নদ-নদী। কিন্তু তারপরও পানি থামল না। তখন ডাঙাও গেল ভেসে। শুধু জেগে রইল পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরি আর লাভা-স্রোত। এই ঠাণ্ডা গরমের মধ্যে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের এবং চেহারার পরিবর্তন হলো। পৃথিবী ঢেকে গেল বরফে– শুরু হল বরফ যুগ, তারপর আবার বরফ গললো আবার এলো গরম। তারপর আবার বরফের যুগ। অনুমান করা হয় এই ঠাণ্ডা গরমের পরিবর্তনের কোন একসময় প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। যার প্রথম রূপ দেখা যায় সমুদ্রের পানিতে শ্যাওলা বা গুল্ম আকারে।

www.pathagar.com

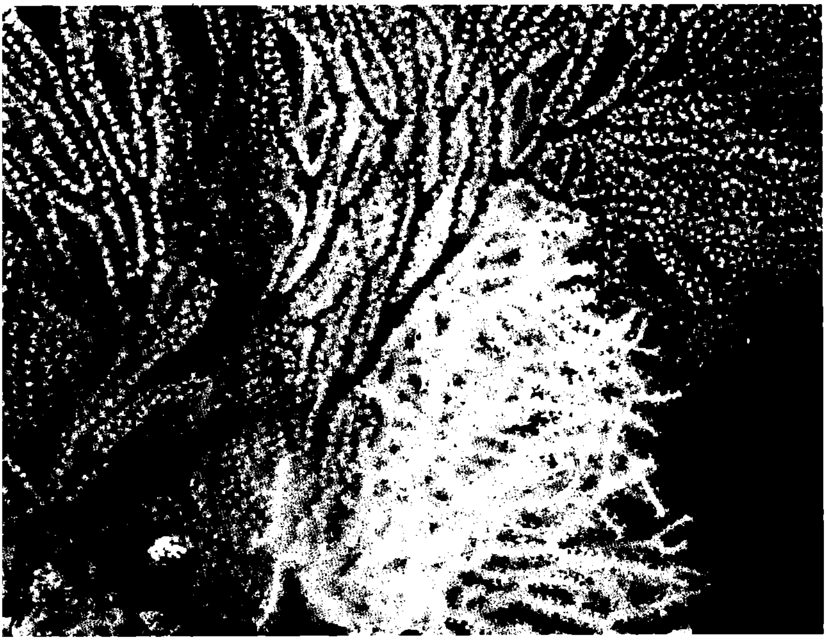

প্যালিওজোইকের পাঁচটি পর্ব। প্রথম ক্যামব্রিয়ান। রোমানীয় নাম ক্যামব্রিয়ান থেকে এই নামের উৎপত্তি। এই পর্বের স্থায়িত্ব ছিল দশ কোটি বছর। এই যুগে শ্যাওলা জাতীয় প্রাণী আরও কিছুটা উন্নত হয় এবং কিছু অমেরুদণ্ডী কৃমি, জেলিফিশ জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হয়। তবে এই সময়ও স্থলভাগে প্রাণের সৃষ্টি হয়নি।

শেষ যুগের সমুদ্র

এর পরবর্তী কালের নতুন যুগের নাম মেসোজোইক। মেসোজোইক অন্যান্য যুগের থেকে কম সময়। এই যুগও তিনটি পর্বে বিভক্ত। যথা (১) ট্রিয়াসিক, (২) জুরাসিক ও (৩) ক্রিটেশান। এইসময় পৃথিবীর অনেকাংশ মরুভুমিতে পরিণত হয়। এই যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মাংসাশী প্রাণী, উড়ন্ত মাছ ও গলদা চিংড়ি জাতীয় উষ্ণ রক্তের প্রাণী এবং ছোট ছোট নদীর সৃষ্টি। এই যুগের শেষ দিকে আবহাওয়া মোটামুটি ভাল হতে থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টি হতে থাকে। প্রাচীনতম পৃথিবীর শেষ যুগকে বলা হয় কেইনোজোইক বা সিনোজোইক যুগ। এই যুগের সূচনা হয়েছে ৭,০০.০০,০০০ বছর আগে। প্রকৃত পক্ষে এই যুগের জের এখনো চলছে। এই যুগকে মূলত দুটি ভাগে

www.pathagar.com

ভাগ করা হয়। টারশিয়ারি ও কোয়ার্টারনারি। টারশিয়ারি যুগের আবার চারটি পর্ব। ইয়োসীন, আলিগোনসীন, মাইওসীন ও Pliosin।

কোয়ারিনারি যুগের আবার দুটি পর্ব– Pliostosin ও হলোসিন। এই উপযুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য মানুষের সৃষ্টি, তাই বলা হয় এখানে থেকেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসের সূচনা।

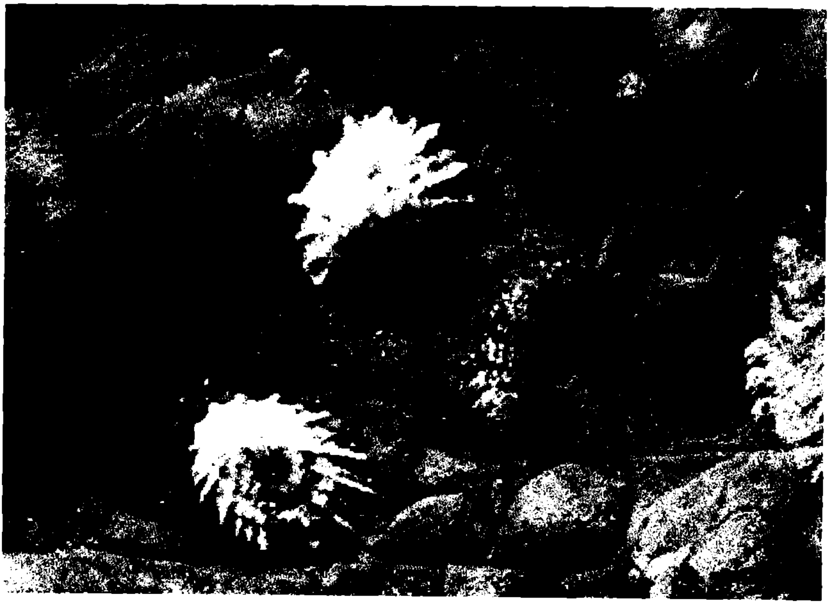

ইয়োসিন পর্ব– ভূবিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর বর্তমান যুগের সূচনা এই সময় হয়। প্রায় ৩ কোটি বছর ছিল এর মেয়াদ এবং প্রায় দেড় কোটি (১,৫০,০০,০০০) বছর আগেই এর সমাপ্তি। এই সময় সমুদ্র আবার অনেক স্থলভাগকে গ্রাস করে। এই যুগেই আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের সৃষ্টি। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী পানির মধ্যে আদিম তিমি এবং সী-কাউ। স্থলে হাতি, গণ্ডার, ঘোড়া, শুকর, গবাদি পশু প্রভৃতি। এইসময় আদিম বানরের দেখাও মেলে।

আলিগোসীন– এই যুগের সৃষ্টি আল্পস পর্বতমালা। আবহাওয়া কিছুটা নাতিশীতোষ্ণ হলেও বরফের জন্য বড় গাছের পরিবর্তে তৃণভূমির সৃষ্টি হয় বেশী। এই সময় উলে⃞খযোগ্য প্রাণী হল লেজবিহীন বানর, প্রাণীবিজ্ঞানীরা যাকে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষ বলেন।

www.pathagar.com

মায়োসীন– প্রায় তের কোটি বছর ছিল এই যুগ। এই যুগে সংকোচন ও সম্প্রসারণের ফলে পৃথিবীর বহু ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে যায়। বহু সাগর মিলিয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন স্থলভাগের ও নতুন নতুন পর্বতমালা। হিমালয় পর্বতমালা এইসময় সৃষ্টি। এই সময় নানা প্রকার স্থলজ জলজ গাছপালা ও জীবজন্তুর সৃষ্টি হয়। সমুদ্রে দেখা দেয় ১৮ মিটার লম্বা হাঙর। সম্ভবত এই সময়েই মানুষের আবির্ভাব ঘটে।

Pliosin– বিশ্ব-ভূগোলের শেষ দিকের পর্ব Pliosin। বর্তমান মহাদেশ এবং মহাসাগরগুলো মোটামুটি ভাবে এই সময় রূপ পরিগ্রহ করে। বর্তমান আবহাওয়ার সূচনা দেখা যায় এই যুগে। এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অতিকায় বড় জীবজন্তুর বিলোপ সাধন এবং নর-বানর ও মানুষের বিস্তার।

Pliostosin-কোয়াটারনারি উপ-যুগের প্রথম ভাগের নাম প্রায়োস্টোসিন। এর অতীত ইতিহাস খুব বেশীদিনের নয়। বলা যেতে পারে মাত্র ১০,০০০ বছর আগের। এই সময়ের শেষ দিকে পৃথিবীর অর্ধেক প্রায় বরফে ঢেকে যায়। তারপর অবশ্য এই যুগেই আবার বরফ গলে সাগর ভরে যায়। এই যুগেই নানা ধরনের এবং বিচিত্রতর পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

www.pathagar.com

প্রাণীজগতে এবং মানুষের মধ্যে ক্রমশ সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির। যদিও বর্তমান মানুষের কোন তুলনা করা যায় না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈহিক পরিবর্তনও ঘটে। এই সময়কার মানুষকে বলা হয় পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ।

হলোসিন– আজকের পৃথিবীর ভৌগোলিক রূপ এবং মানুষ সহ অন্যান্য জীবজন্তুর জৈবিক রূপের অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায় এই হলোসীন যুগে। তাই এই যুগের শেষ ভাগকে বর্তমান যুগের সূচনা পর্ব বলা হয়। এমন কি এই যুগের আবহাওয়া অনেকটা বর্তমান যুগের মতো ছিল। বর্তমান সমাজতত্ত্ববিদরা এই যুগের শেষ ভাগকে এবং বর্তমান যুগের সূচনা ভাগকে দেখিয়েছেন মানুষের শিকারের যুগ, পশুচারণের যুগ এবং কৃষি যুগের মধ্য দিয়ে। কৃষিযুগেই মনুষ্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প যুগের চরম বিকাশ।

প্রাণের উৎস সমুদ্র

সমুদ্রের পানিতে পৃথিবীর প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এখনও ডাঙার বুকে যত না জীব বাস করে, তার সহস্র গুণ বাস করে সমুদ্রের নিচে। আর রয়েছে কোটি কোটি টন সবুজ শ্যাওলা বাতাসে অক্সিজেন তৈরিতে যাদের ভূমিকা অপরিসীম।

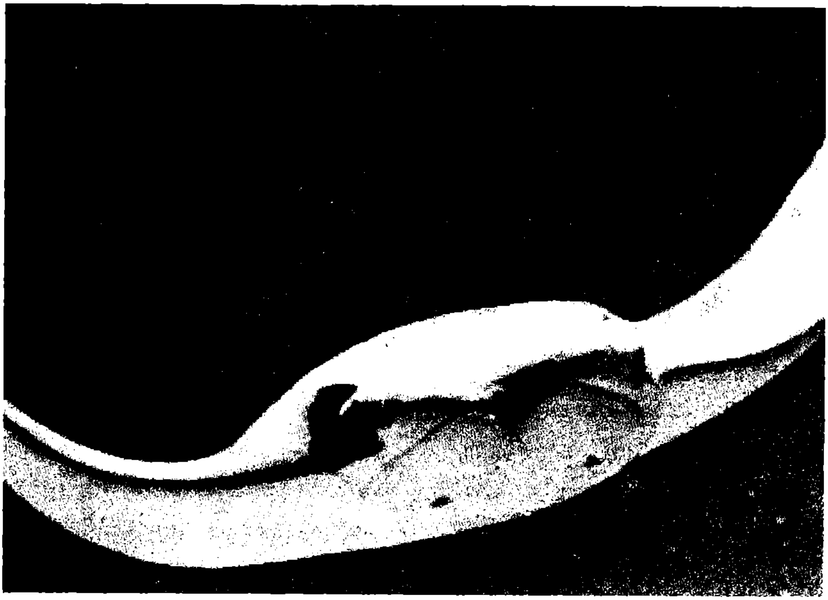

www.pathagar.com

এছাড়াও সমুদ্রে রয়েছে বহু রকমের খনিজ পদার্থ। লবণের কথা তো আমরা জানি। অন্যান্য যেসব খনিজ আছে, তার মধ্যে প্রথম হল ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, নিকেল, কোবাল্ট, তামা, সীসা, সোনা ও রূপা। কোন কোন মৌলিক পদার্থ আবার ডাঙার চেয়ে সমুদ্রেই রয়েছে বেশি পরিমাণে। যেমন ইউরেনিয়াম। ডাঙার তুলনায় এই অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থটি সমুদ্রে রয়েছে প্রায় ১০০০ গুণ বেশি। বিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্রে যা ইউরেনিয়াম আছে তার শতকরা এক ভাগও যদি সমুদ্র থেকে তোলা যায়, তা দিয়ে সারা পৃথিবীর ৩০০ বছরের জ্বালানী খরচ চলে যাবে।

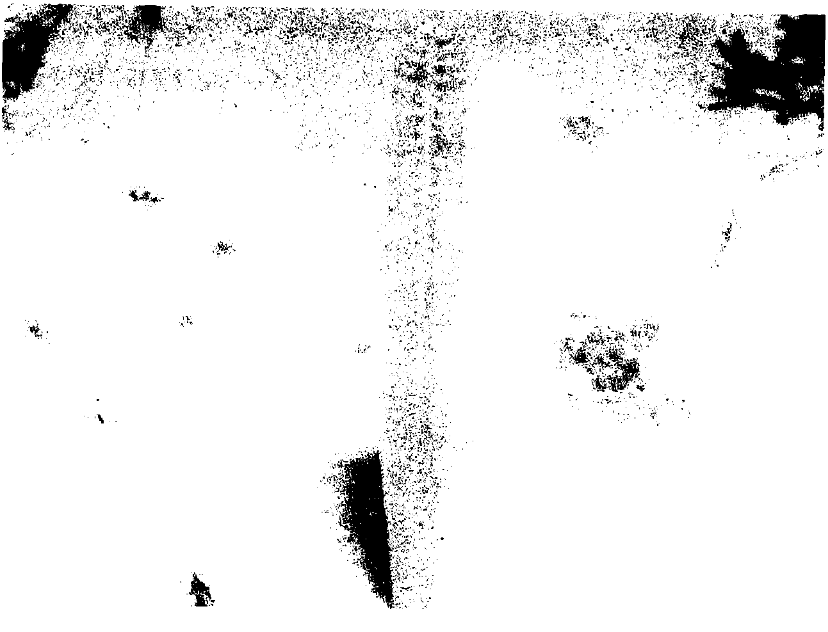

সমুদ্রকে আমরা বলতে পারি প্রকৃতির লেখা একটি বই। যার মধ্যে বিভিন্ন গাছপালা ও প্রাণীর জীবন্ত অবস্থান বা অনেক আগের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীর ফসিল যেন ছবির মতো রাখা আছে। এই হিসেবে এটি একটি চলমান এ্যালবাম বললেও ভুল হবে না। ভূ-তাত্ত্বিক ও জীববিজ্ঞানীরা এই বই বা এ্যালবাম পাঠ করে উন্মোচিত করছেন পৃথিবীর অতীত ইতিহাস। এভাবেই জানতে পেরেছেন পৃথিবীতে বহুকাল আগে লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীরা কে কেমন ছিল তার বৃত্তান্ত। এই পর্বে আমরা সমুদ্রের গভীরের বিচিত্র প্রাণী সম্পর্কে জানবো। তবে প্রথমেই জেনে নিই সমুদ্রের পানি সম্পর্কে।

www.pathagar.com

সমুদ্রের পানির উপকারিতা

আমরা জানি পৃথিবীর বেশিরভাগ পানিই সমুদ্রে জমা হয়ে আছে। এই পানি লোনা বলে আমাদের কোন কাজে আসে না। কিন্তু অন্যভাবে সমুদ্র যে আমাদের কত উপকার করে তার ঠিক নেই। সমুদ্র যদি না থাকত, তাহলে কিছুতেই প্রাণের বিকাশ ঘটত না। পৃথিবীর জলবায়ুও হতো অন্যরকম। সুতরাং পৃথিবীর পরিচয় নিতে হলে সমুদ্রকে জানা একান্তই প্রয়োজন।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীতে মোট ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার পানি আছে। পৃথিবীর উপরিতলের মোট আয়তন ৫১ কোটি ৯ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৩৫ কোটি ১২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে এই পানি। অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিতলের ১০০ ভাগের প্রায় ৭২ ভাগই পানিতে ঢাকা। এই পানির পরিমাণ প্রায় ১৩০ কোটি ঘন কিলোমিটারের মত। বাকি পানির বেশিরভাগটাই রয়েছে গ্রীণল্যাণ্ড ও মেরুদেশের বরফে। মাটির জলায়, হ্রদ-পুকুর-নদী-নালা-খাল-বিল এবং আকাশে জলীয় বাষ্প রূপে যা পানি আছে তার মোট পরিমাণ ১ ভাগও নয়। অর্থাৎ এককথায় পৃথিবীতে যা পানি আছে তার ৯৭ ভাগই রয়েছে সমুদ্রে। সুতরাং এদিক থেকেও আমরা দেখছি, পানি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সমুদ্রের কথা এসে পড়বেই।

www.pathagar.com

স্থলভাগের উচ্চতা

সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে স্থলভাগের গড় উচ্চতা ৭০০ মিটারের মত। পৃথিবীর উপরিতল এইভাবে উঁচু নিচু না হলে সমুদ্রের সৃষ্টি হত না। ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত পানি সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ত। পৃথিবী হত পানিতে ঢাকা বিচিত্র একটি গ্রহ। হিসেব করে দেখা গেছে, এই অবস্থায় সম্পূর্ণ পৃথিবী প্রায় আড়াই হাজার মিটার গভীর পানির তলায় চলে যেত।

এমনিতে সমুদ্রের গড় গভীরতা হচ্ছে ৩,৮০০ মিটারের মত। কিন্তু কোন কোন জায়গায় এই গভীরতা আরো বেশি। তবে সবচেয়ে গভীর প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানাস ট্রেঞ্চ এলাকা (১১,০৪০)। এছাড়া ৮৯০০০ মিটার গভীর এলাকা সমুদ্রের অনেক জায়গাতেই আছে।

মহাসমুদ্র থেকে পৃথিবী

আমরা থাকি মাটির ওপরে, খাদ্য আহরণও করি মাটি থেকেই। মাটি না থাকলে জীবনের বিকাশ সম্ভব হত না। সুতরাং মাটি কি, কিভাবে মাটির জন্ম হল তা আমাদের জানা দরকার।

www.pathagar.com

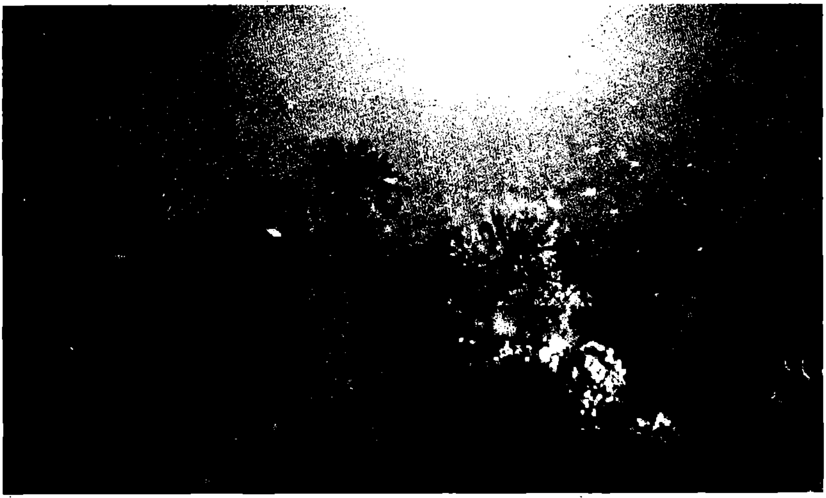

আগ্নেয়শিলা থেকেই যে মাটির জন্ম হয়েছে, একথা আমাদের অনেকেরই জানা। আগ্নেয়শিলার আবার দুটো ভাগ। গ্র্যানাইট শিলা এবং ভলকানিকা বা ব্যাসাল্ট শিলা। গ্র্যানাইট শিলা মূলত কোয়ার্জ, কেলাস এবং অভ্র-এই তিনটি খনিজ পদার্থ দ্বারা তৈরি। ব্যাসাল্টের ঘনত্ব গ্র্যানাইটের চেয়েও বেশি। এতে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ বালি থাকে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়

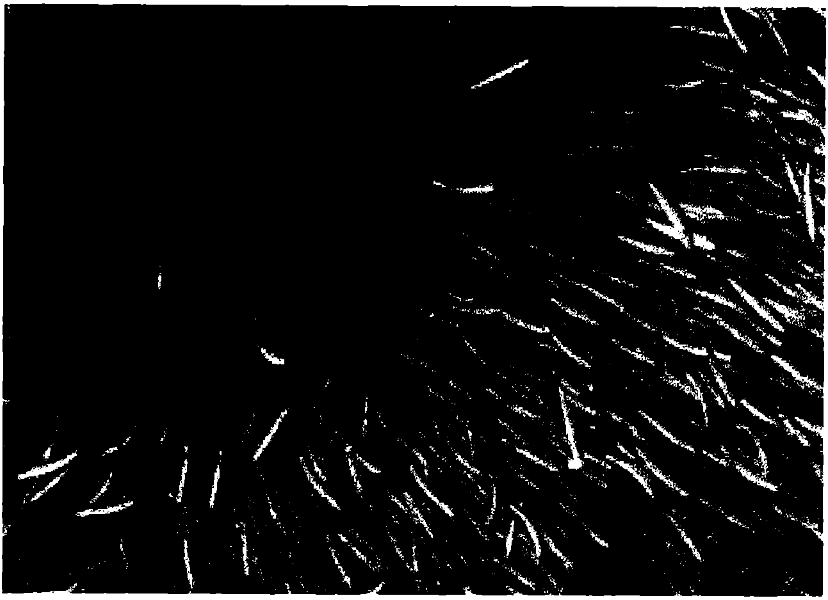

www.pathagar.com

পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে যে গলিত লাভা বেরিয়ে আসে, তার বেশিরভাগটাই ব্যাসাল্ট শিলা।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই দুই ধরণের আগ্নেয়শিলা আবার বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে পাললিক শিলায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তন দুই-এক বছরে হয়নি। বহু লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর উপরিভাগে জমে থাকা আগ্নেয়শিলা

সূর্যকিরণ, পানি স্রোত এবং বায়ুপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমুদ্র, নদী বা হ্রদের তলদেশে জমা হয়েছে। পাললিক শিলার তাই আর এক নাম স্তরীভূত শিলা।

এই তিনধরণের শিলা ছাড়া আরো অনেক শিলা আছে। যেমন নাইস, চুনাপাথর, মার্বেল পাথর, কোমার্টজাইট ইত্যাদি। বিজ্ঞানীদের হিসেবে এইরকম সাড়ে আটশো শিলা দিয়ে আমাদের এই ভূত্বক গড়ে উঠেছে। এই সাড়ে আটশো রকমের শিলাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়– মহাদেশিক ও সামুদ্রিক।

মহাদেশিক শিলা ওজনে হালকা, এতে সিলিকা ও অ্যালুমিনার পরিমাণ বেশি। সামুদ্রিক শিলা ওজনে ভারি, কেননা তাতে রয়েছে লোহা ও ম্যাগনেসিয়ামের প্রাচুর্য।

পৃথিবীপৃষ্ঠ যে সব শিলা দিয়ে তৈরি তাতে বিভিন্নপ্রকার খনিজদ্রব্য মিশে রয়েছে। খনিজপদার্থ আবার দুইরকমের। ধাতব ও অধাতব। লোহা, তামা, সোনা খনিজ এবং কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি অধাতব খনিজ।

www.pathagar.com

পৃথিবীপৃষ্টে ক্রমবিকাশের ধারায় শিলারা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত আছে। কখনও কোন কারণে শিলার ওপরে প্রচণ্ড চাপ পড়লে শিলাস্তরে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং ফাটল বরাবর শিলাস্তরের বিচ্যুতি ঘটে। তখন ভুগর্ভে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়, ফলে ভূপৃষ্ঠও কাঁপতে থাকে। ভুমিকম্পের আরো অনেক কারণ থাকলেও শিলাচ্যুতির ফলে ভুমিকম্পই সবচেয়ে মারাত্মক। একে টেক্টনিক ভূমিকম্প বলে।

এইবার আসা যাক মাটির কথায়। ক্ষয়প্রাপ্ত শিলার থেকেই মাটির সৃষ্টি। তবে শুধু শিলা নয়, বিভিন্ন খনিজপদার্থ, জীব ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ বহু লক্ষ

www.pathagar.com

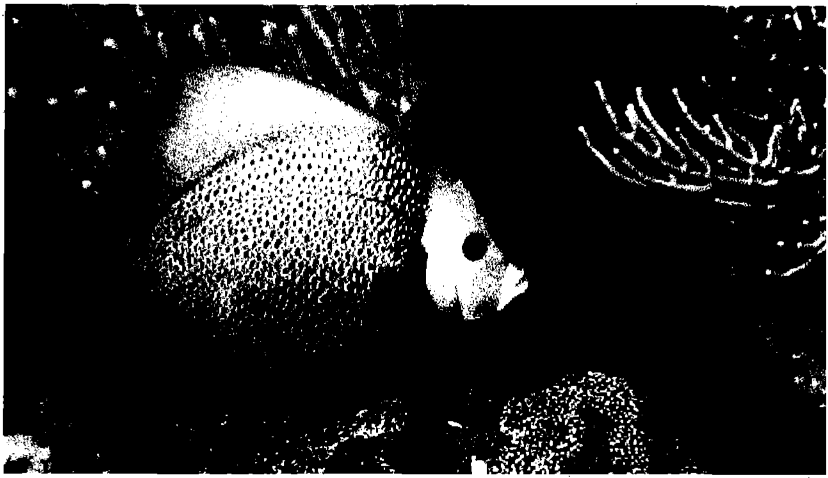

কোটি বছর ধরে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় চূর্ণিত শিলার সঙ্গে মিশে আজকের এই মাটি তৈরি করেছে। শিলা থেকে মাটি তৈরিতে জীবাণু, পানি এবং বাতাসেরও একটি ভূমিকা আছে। এই মাটির আবার বহু রকমের ভাগ আছে। বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, দোআঁশ মাটি, পলিমাটি ইত্যাদি।

সমুদ্রের প্রাচীন উদ্ভিদ

উদ্ভিদ নিয়ে কোন আলোচনা করার আগে আদিম যুগের গাছপালা সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া দরকার।

www.pathagar.com

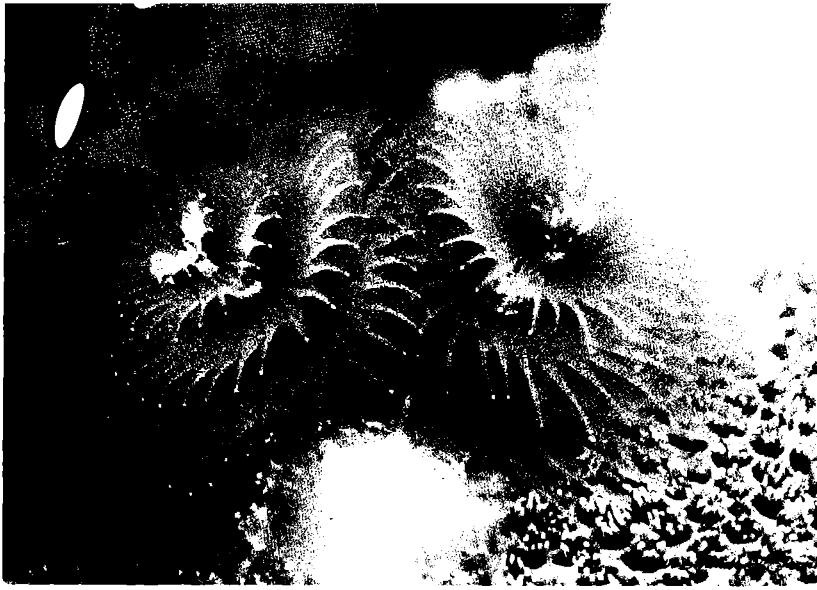

প্রথম যুগের গাছপালার সবই ছিল শ্যাওলা জাতের। সমুদ্রের পানিতে একটা কোষ নিয়েই তাদের জীবন শুরু হয়েছিল। এককোষী শ্যাওলারা এত ছোট যে খালি চোখে এদের দেখাই যায় না– একমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের দেখতে পাওয়া যায়। পরে বিবর্তনের মাধ্যমে এদের অনেক বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় তিরিশ হাজার রকমের শ্যাওলা খুঁজে পেয়েছেন।

শ্যাওলাকে আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভিদ বলে মনে না-ও হতে পারে। কেননা এর না ডালপালা, না ফুল-ফল, না বীজ। কিন্তু এ সব না থাকলেও শ্যাওলা উদ্ভিদ– তবে খুব নিচু স্তরের। মনে রাখতে হবে এই শ্যাওলার জন্ম হয়েছিল এখন থেকে প্রায় পৌনে তিনশ কোটি বছর আগে। তখন পৃথিবীতে প্রায় কোন প্রাণীই ছিল না। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর আবহাওয়াটাও ছিল তখন অন্য রকম। এখনকার তুলনায় তখন অনেক গরম ছিল পৃথিবী। তার ওপর বাতাসে অক্সিজেন ছিল না– জীব জগতের বিকাশের পক্ষে যা ছিল একান্ত জরুরী।

শ্যাওলার রঙ সবুজ– এটা তোমরা নিশ্চয় দেখে থাকবে। অন্যান্য উদ্ভিদের মত শ্যাওলারও প্রধান উপকরণ ক্লোরোফিল– যার জন্য ঐ সবুজ রঙ। ক্লোরোফিল থাকার ফলে শ্যাওলা সহজেই বাতাস থেকে কার্বনডাই-

www.pathagar.com

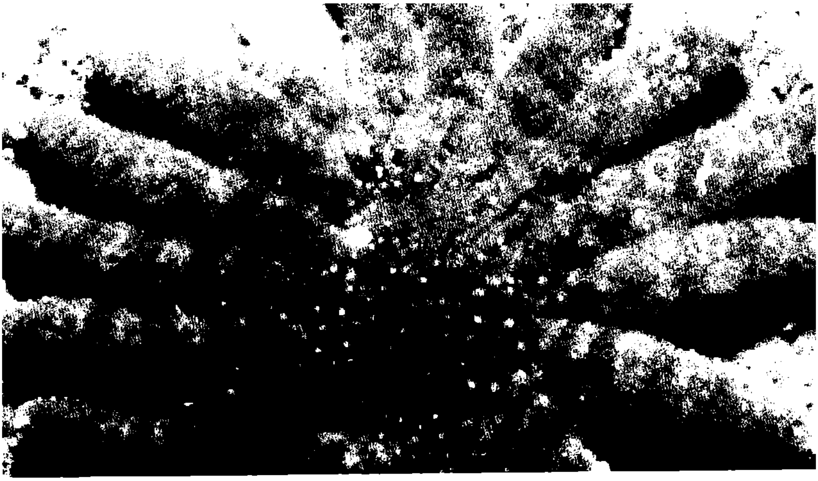

অক্সাইড শোষণ করে অক্সিজেন তৈরি করতে শুরু করল। কিছু দিনের মধ্যেই বাতাসে অক্সিজেন বাড়তে শুরু করল। ওদিকে বিবর্তনের মাধ্যমে শ্যাওলা এবং আরো অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের সৃষ্টি হল। কিছু কিছু গাছ সমুদ্রের তীরেও জন্মাতে লাগল, যেখানে অল্প পানি। ক্রমে আরো বহু শত বছর চলে যাবার পর দেখা গেল পানিতে এবং ডাঙায় অজস্র উদ্ভিদ ছেয়ে গেছে।

'বহু শত বছর' কথাটা শুনে চমকে যেও না যেন। আমাদের জীবনে দু'দশ বছরই অনেক– সেখানে শত শত বছর তো আরো অনেক বেশি। কিন্তু পৃথিবীর জীবনে কয়েক শত বছর কিছুই নয়। বিশেষ করে একেবারে প্রথম

www.pathagar.com

দিকে পৃথিবীতে জীবনের বিকাশ হয়েছিল খুব ধীরে ধীরে। কিন্তু একবার যখন ডাঙায় গাছপালার বসতি শুরু হল, তখন তা বেড়ে চলল হুহু করে। বিশেষ করে ডাঙায় তখন কোন জীবজন্তু ছিল না– ফলে বৃদ্ধি খুব দ্রুতগতিতে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গাই ঢেকে গেল গাছপালাতে।

একটা কথা জেনে রাখা দরকার, এই সব গাছ কিন্তু মোটেই এখনকার মত ছিল না। তাদের না ছিল ফুল, না হত ফল। আকারও ছিল তাদের অতিকায়। এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ হল টেরপসিড, স্ফোনপসিড ও লাইকোপসিড। এর মধ্যে শেষ দুটি ধারা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে

www.pathagar.com

গেছে। মাত্র দুটো প্রতিনিধি কোন রকমে টিকে আছে এখনও– যদিও তাদের দেখে এখন আর চেনবার উপায় নেই, অতীতে তাদের কি রবরবা ছিল। এখন তাদের দেখলে অতি সাধারণ ঘাস বা ঐ জাতীয় কিছু মনে হবে। এই দুই প্রতিনিধির নাম লাইকোপোডিয়াম ক্লেভেটাম বা ক্লাব-মস, এবং ইকুইজিটাম গ্রেটেন্স বা হর্স-টেইল। সাধারণত উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে বা জলাভূমির ধারে এই সব গাছ কদাচিৎ নজরে পড়ে।

এ সময়কার লাইকোপড জাতীয় উদ্ভিদ থেকেই পরবর্তীকালে লেপিডোডেনড্রন, সিগিলারিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের জন্ম হয়। এ ছাড়া ছিল টেরপসিডের প্রথম প্রতিনিধি– এক ধরণের অতিকায় ফার্ণ গাছ। এদের কোন কোনটির উচ্চতা ছিল ১০৩ ফুট পর্যন্ত।

এই সব গাছ কোথায় গেল বা লুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকলে কি করে লুপ্ত হল– জানতে নিশ্চয় কৌতূহল হচ্ছে তোমাদের। বিজ্ঞানীরা এর অনেক কারণ অনুমান করেন। কিন্তু প্রধান কারণ হল, পৃথিবীর খামখেয়ালী আবহাওয়া। পৃথিবীর জীবনকালের মধ্যে বেশ কয়েকটা তুষার যুগ এসে গেছে। তুষার যুগ কেন আসে এ সম্বন্ধে এখনও সঠিকভাবে কিছু জানা যায়নি, কিন্তু তুষার যুগ যে ঘুরে ফিরে আসে এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত। এই তুষার যুগ এলেই সারা পৃথিবী বরফের তলায় চাপা পড়ে যায়। ফলে গাছপালা সব যায় নষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে। তারপর তুষার যুগ শেষ হয়ে গেলে আবার গাছপালা জন্মাতে শুরু করে। এ ছাড়া ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, খরা– এ সব তো আছেই। এই ভাবেই বারবার বনভূমি ধ্বংস হয়, আবার গজিয়ে ওঠে।

এইভাবে দুশো একশো নয় কোটি কোটি বছর কেটে গেছে। এতদিন ধরে যে সব গাছপালা নানা কারণে মাটির তলায় চাপা পড়েছে, তাদের ওপর যুগ যুগ ধরে মাটি, পাথরের আস্তরণ পড়ে আরো বেশি চাপ দিয়েছে। এইভাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মাটির নিচের গরম আর প্রচণ্ড চাপের ফলে সেই সব গাছপালা কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে।

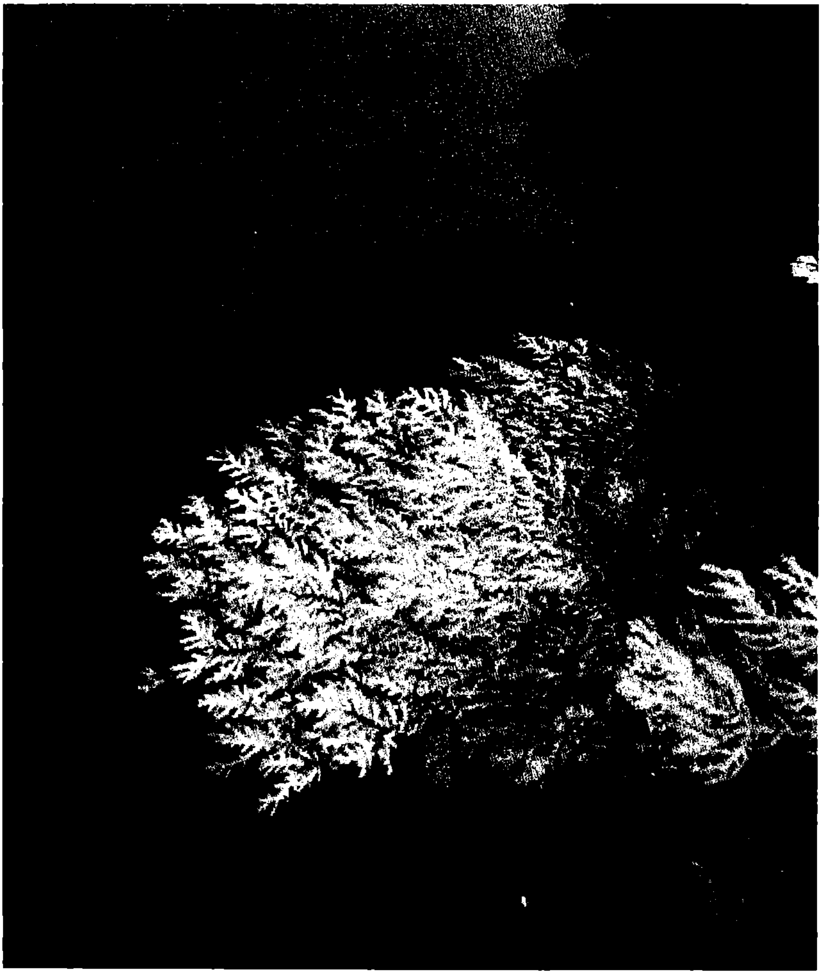

www.pathagar.com

পৃথিবীর প্রথম মাছ

পৃথিবীতে প্রথম দিকে বসবাসযোগ্য প্রাণীরা অনেকটা পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী যেন তৈরি হতো। সেই সময়ের মাছের যে ফসিল পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় সৃষ্টির শুরুর দিকের অর্থাৎ পৃথিবীর প্রথম মাছের কোন কানকো ছিল না। কোন ধরনের ভার্টেব্রাও ছিল না। একধরনের শক্ত আবরণে পেটের কাছ পর্যন্ত মোড়ানো থাকতো। ধারণা করা হয় আদিযুগে সমুদ্রের তলদেশের কঠিন পাথরে ঠুকে ঠুকে গত খুঁড়ে এরা খাবার জোগাড় করতো। আর সেই খাবার জোগাড়ের চাহিদা অনুযায়ী এদের শারীরিক বিকাশ ঘটতো।

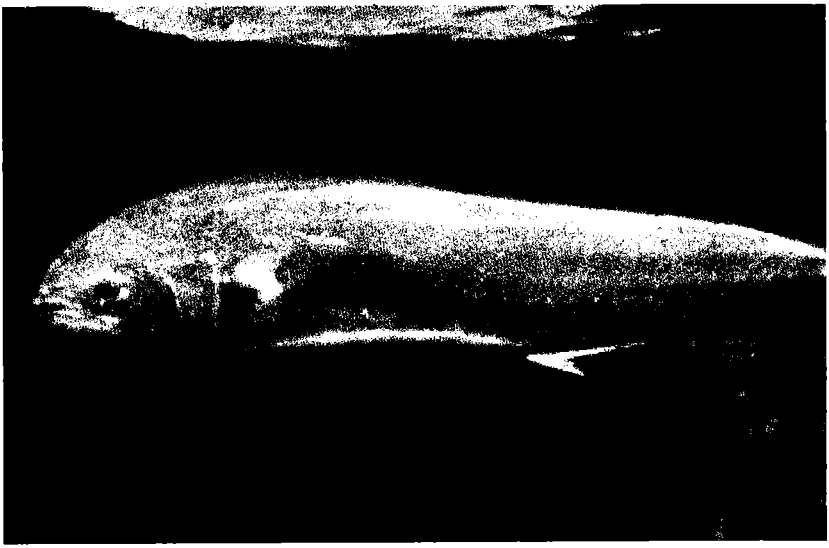

পরবর্তীতে খাবারের জোগান বাড়ার সাথে সাথে এসব মাছের ক্ষেত্রেও জীববৈচিত্র্যের চিরন্তন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো। সময়ের চাহিদার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে এসব মাছ একসময় বিলুপ্ত হয়ে গেল। তার জায়গা দখল করলো নতুন দিনের মাছ। তাও সেটা কয়েক হাজার বছর আগের কথা।

সমুদ্রের প্রাণী

সূর্যের আলো ছাড়া গাছ বাঁচে না, সুতরাং সূর্যের আলো সমুদ্রের ভিতর যতদূর যায়, ততদূরই গাছপালা হয়। এই গাছ যে সব মাছের খাদ্য তারা ওই গাছের কাছাকাছিই থাকে। আবার সেই মাছ যে সব মাছেদের খাদ্য তারাও

www.pathagar.com

থাকে ওদেরই আশেপাশে। তাই বলা যায় সমুদ্রের বেশীর ভাগ জীবই মোটামুটি উপরের দিকেই থাকে।

এই উপর দিকের পানির বেশীর ভাগ প্রাণীর খাদ্য হচ্ছে Plankton। এই Plankton ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। খালি চোখ এদের দেখতেই পাওয়া যায় না। ঝাঁক ঝাঁক এই Plankton-এর মধ্যে থাকে কাঁকড়া, চিংড়ি, জেলি ফিশ প্রভৃতি নানা জাতের প্রাণী, তাদের ডিম, তাদের শুককীট, বাচ্চা প্রভৃতি, আর তার সঙ্গে থাকে লাখো লাখো উদ্ভিদের কণা।

www.pathagar.com

এই সব মিলেই হয় Plankton। পানির বেশীরভাগ প্রাণীই এক একবারে হাজারে হাজারে ডিম পাড়ে। রিং নামে এক রকম মাছ এক একবারে ডিম পাড়ে ২ থেকে আড়াই কোটি, কড মাছ ডিম পাড়ে ৭০/৮০ লক্ষ, হেরিং ৫০/৬০ হাজার, ইলিশ ১৫/২০ লক্ষ, শুক্তি পাড়ে ৭/৮ কোটি।

এই সব ডিমের অধিকাংশই চলে যায় অন্যান্য মাছেদের পেটে, তারপর ডিম থেকে বেরুনো শুককীট তাও চলে যায়, আর এই কারণেই সমুদ্রটা বিভিন্ন মাছ, প্রাণীর ডিম ও বাচ্চা দিয়ে ভরে যাচ্ছে না।

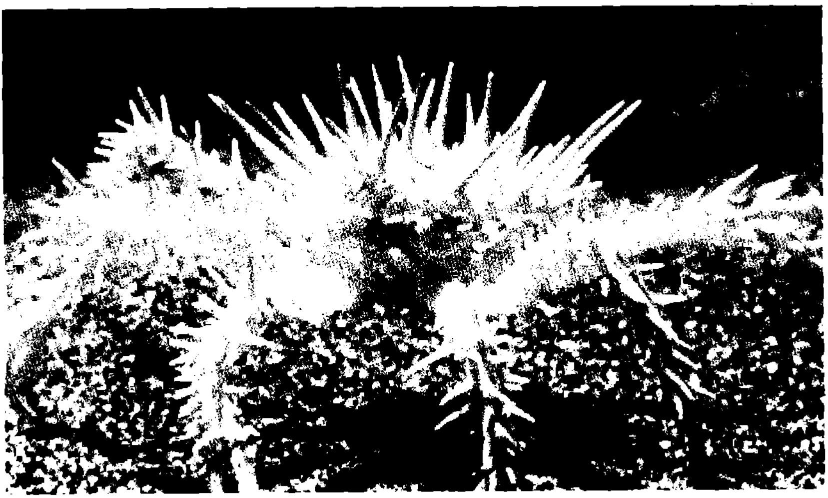

www.pathagar.com

চোখে দেখা যায় না এমন নানা জাতের এককোষী উদ্ভিদ সমুদ্রে আছে। এ ছাড়া শেওলা ও ঘাস জাতীয়, যে সব উদ্ভিদ আছে তাদের কেউ ফিকে সবুজ, কেউ ঘন সবুজ, কেউ বা ঘন মেটে রঙের। খুব নীচের দিকে বেগুনী রঙের উদ্ভিদ, এমন কি লাল শেওলাও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া আছে পামগাছের মত হাতখানেক উঁচু এবং ব্যাঙের ছাতার মতো গাছ। এসব ছাড়া আরও কত যে বিচিত্র বর্ণের ও জাতির উদ্ভিদ সমুদ্রের তলদেশে আছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

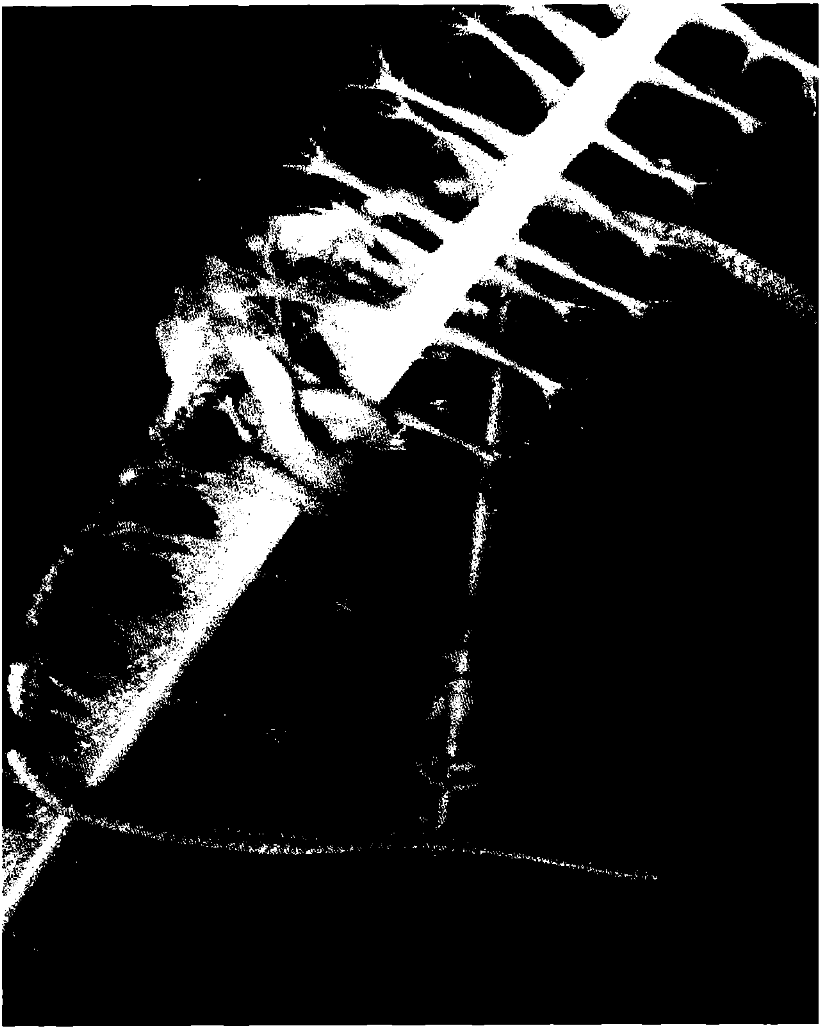

www.pathagar.com

সামুদ্রিক প্রাণীর বৈচিত্র্য

আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও আরো অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী বিভিন্ন অঞ্চলভেদে বসবাস করে। এই প্রাণীজগত যেমনই বিচিত্র তেমনই কৌতুহল উদ্দীপক। আমাদের চারপাশে সব সময়ই অসংখ্য ধরনের প্রাণী ছড়িয়ে আছে। আমরা যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি কেউ তাতে ভেসে বেড়াচ্ছে; আবার আমরা যে পানি খাচ্ছি কেউ তাতে সাঁতার কাটছে, আবার কেউ কেউ আমাদের শরীরের মধ্যেই বাসা বেঁধে বসে আছে।

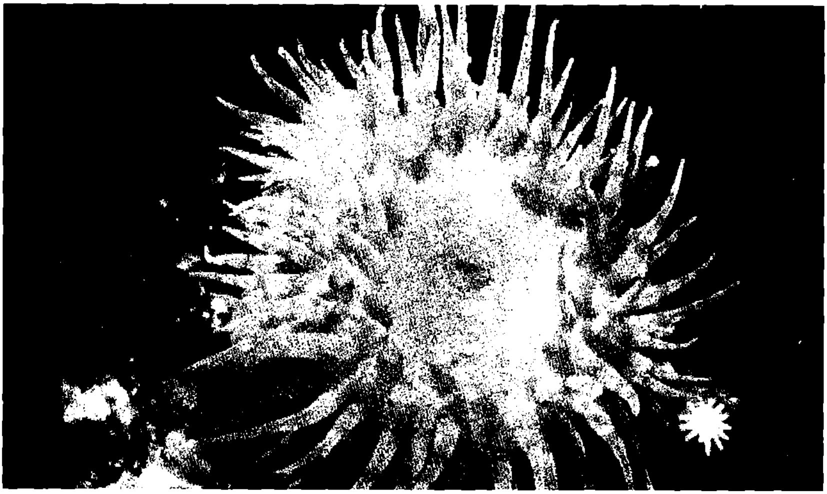

www.pathagar.com

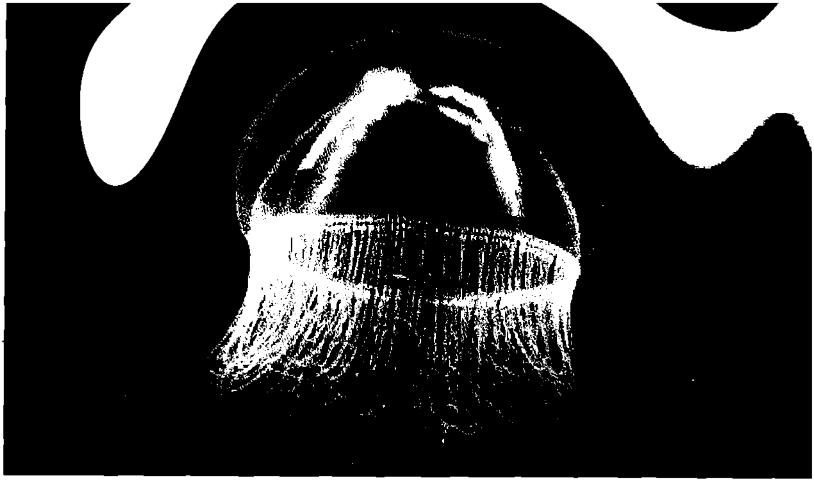

সত্যি, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে আমাদের শরীরের মধ্যে কত কোটি কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বসবাস করছে। এদের সবগুলোই যে আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক তা কিন্তু নয়। কিছু কিছু আমাদের নানারকম উপকারও করে এবং এদের অনুপস্থিতিতে আমরা রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়ব।

কখনও যদি একফোঁটা খাবার পানি বা আমাদের শরীরের কোন অংশ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে, ঐ অতটুকু জায়গার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ অণু কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। এ তো গেল যাদের চোখে দেখা যায় না। যারা দৃষ্টিগোচর তারাও কি সংখ্যায় কম? এইসব দৃষ্টিগোচর প্রাণীরাও

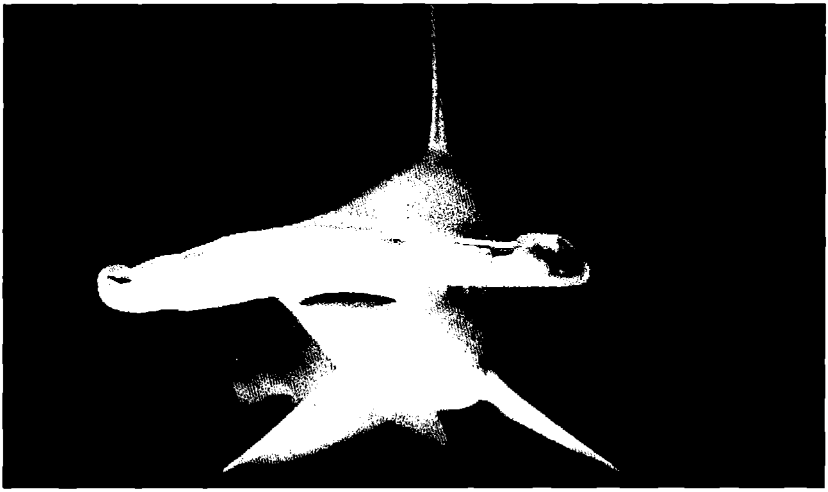

www.pathagar.com

আকৃতি প্রকৃতি সবকিছুতেই একজন আর একজনের থেকে আলাদা। আমরা মানুষেরা অস্তিত্ব রাখার জন্য অনেক প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। আবার সেই সকল প্রাণীরাও তাদের অস্তিত্ব রাখার জন্য আরো কতকগুলো প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। এভাবে তৈরি হয়েছে একটা বিরাট শিকল বা চেইন (Chain)। এখানে সবার জন্যই সবাইকে থাকতে হবে। এই পৃথিবীটা একটা বিশাল বাড়ি। তাতে সবাই-ই একসাথে থাকছে এবং সবারই কিছু না কিছু অবদান আছে। প্রকৃতিতে অদ্ভুত জটিলভাবে এই ভারসাম্য রক্ষিত হয়। মানুষ এই ভারসাম্য নষ্ট করে ফেললে মানুষের অস্তিত্বও অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

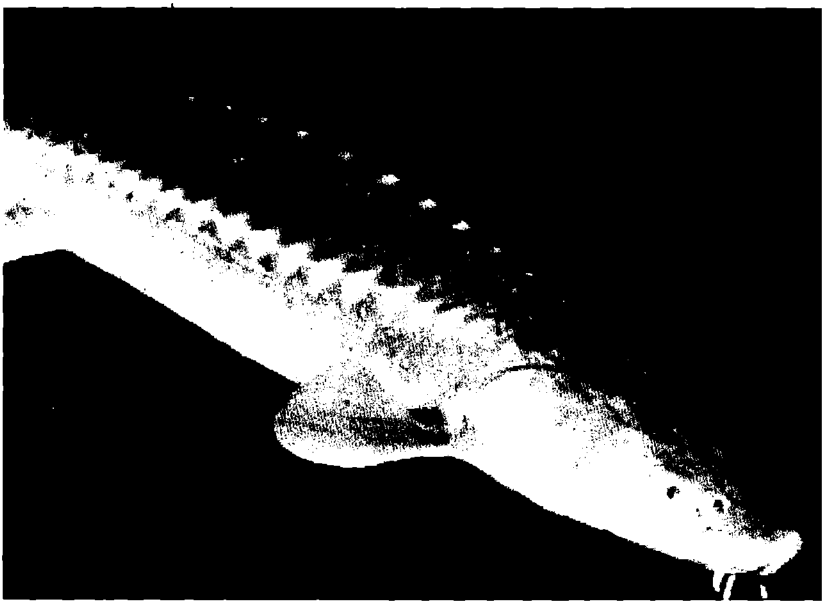

প্রতিটি প্রাণীই তার শারীরিক ক্ষমতা, বুদ্ধি, কাজ অনুসারে আলাদা আলাদা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে। সেই অনুসারে তাদের মধ্যে দেখা যায় আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। যেমন জলজ প্রাণী প্রধানতঃ ফুলকার সাহায্যে নিঃশ্বাস নেয়। আর ডাঙার প্রাণী নেয় ফুসফুসের সাহায্যে।

আবার ডাঙার প্রাণী চলাফেরা করে মূলত পা-এর সাহায্যে. আর পাখি বা আকাশের প্রাণীরা চলাফেরা করে ডানার সাহায্যে। উড়তে সুবিধার জন্য পাখির শরীরের ওজন হয় হালকা। তেমনি প্রজাপতির গায়ের রং হয় ফুলের মতো চিত্র-বিচিত্র যাতে এরা প্রাণ ধারনের জন্য সহজেই ফুলের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারে। ঘাস ফড়িংয়ের রং হয় একদম ঘাসের মতো। ঘাসের মধ্যে বসে থাকলে

www.pathagar.com

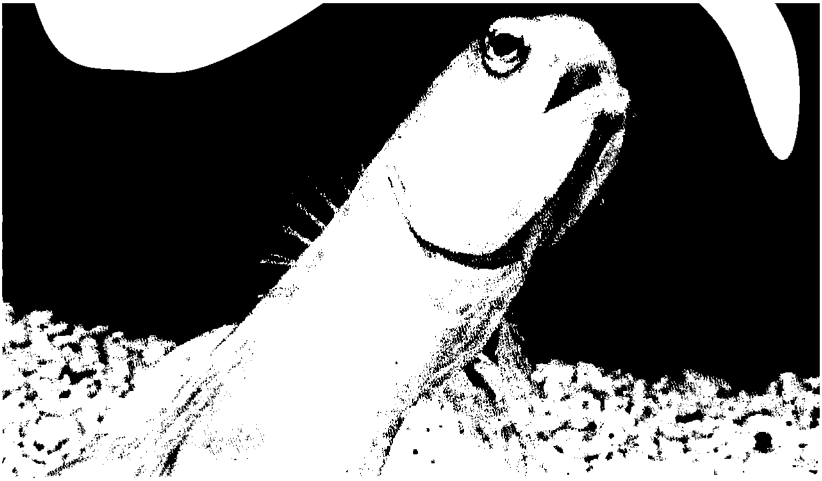

এদের আলাদা করে চেনাই যাবে না। আবার কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা প্রয়োজন মতো গায়ের রং বদলাতে পারে।

সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন হয়েছে। যেসব প্রাণী এই পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের আস্তে আস্তে পরিবর্তিত করেছে বা করতে পেরেছে তারা বহুকাল ধরে পৃথিবীতে টিকে আছে। আর যারা পারেনি তারা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এই সব প্রাণীর কথা আমরা এখন জানতে পরি তাদের ফসিল থেকে।

www.pathagar.com

বিচিত্র এই পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক প্রাণীদের আরও বিচিত্র তথ্যাবলী চিত্রসহ তোমাদের সামনে তুলে ধরা হলো।

সামুদ্রিক প্রাণীর প্রকরণ

সমুদ্রের পানিতে যেমন ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়া জাতীয় শক্ত খোলসের ছোট ছোট জীব আছে, তেমনি কাদার মতো নরম জেলিফিশ, তারা মাছ আর পাঁচ-সাত মণ ওজনের বিরাট বিরাট মাছও আছে। এছাড়া ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা তিমি, শার্ক, হাঙ্গর, উড়ুক্কু মাছ, অক্টোপাস বিদ্যুতের মত শক্ লাগানো ইল মাছও আছে।

www.pathagar.com

বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক মাছ

পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস থেকে জানা যায়, সমুদ্রই সকল প্রাণের উৎস। এছাড়া সমুদ্রে বসবাসরত বিভিন্ন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রয়েছে। এমন কিছু কিছু মাছ রয়েছে– যেগুলোকে মাছ নামে আখ্যা দেয়া হলেও সেগুলো মূলত মাছ নয়। বরং এক ধরনের

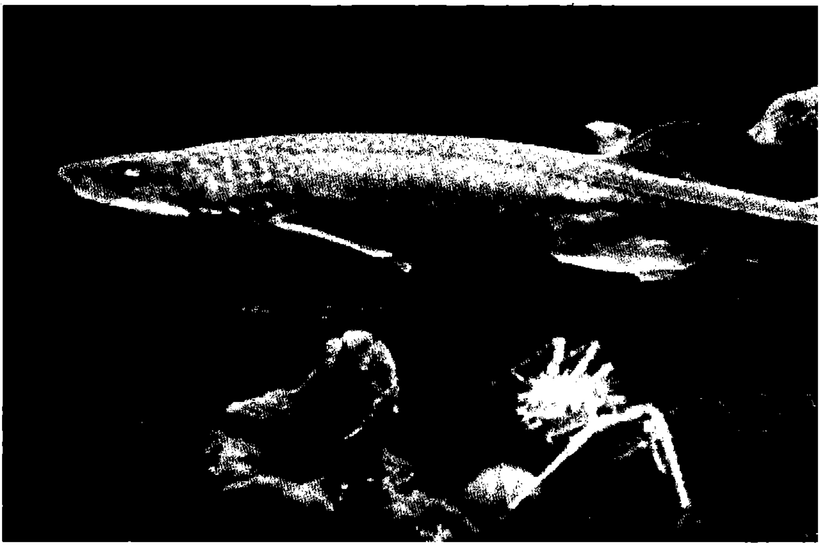

এককোষী প্রাণী। কিন্তু সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্যের তালিকায় এগুলোকেও মাছ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাধারণত মাছ মেরুদণ্ডী জলজ প্রাণী। উষ্ণ রক্তের এ প্রাণীটির শরীর সাধারণত আঁশ দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। সাঁতার কাটার জন্য এদের দুই বা তার চেয়ে বেশি জোড়া পাখা রয়েছে।

বর্তমানে সাধারণ জলাশয়ে যেসব মাছ পাওয়া যায় বা আমরা যেসব মাছ সচরাচর বাজার থেকে কিনে বা পুকুর কিংবা নদ নদী খালবিল থেকে আহরণ করি– সেগুলোর মূল উৎসস্থল হলো সমুদ্র। এখনও অন্বেষণ করলে এসব মিষ্টি পানির মাছের পূর্বপুরুষদের খুঁজে পাওয়া যাবে সমুদ্রের গভীর পানিতে। বর্তমানে মিষ্টি পানির উৎস থেকে শুরু করে সাগরের গভীর পর্যন্ত মাছের বসবাস। পুরো পৃথিবীতেই মাছ খাবার হিসেবে জনপ্রিয়। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ৩১ হাজার পাঁচ শ' প্রজাতির মাছের দেখা পাওয়া গেলেও এ সংখ্যাটা আরো বিশাল বলেই সবার ধারণা।

www.pathagar.com

মাছেরাও যে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে! এই কথাবার্তার জন্য অবশ্য তারা ব্যবহার করে নিজস্ব ভাষা। কোনো মাছ দাঁতে দাঁত ঘষে এক ধরনের শব্দ তৈরির মাধ্যমে অন্য মাছের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার কোনো মাছ সাঁতরানোর পাখনা নেড়ে শব্দ তৈরি করে অন্য মাছের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে থাকে।

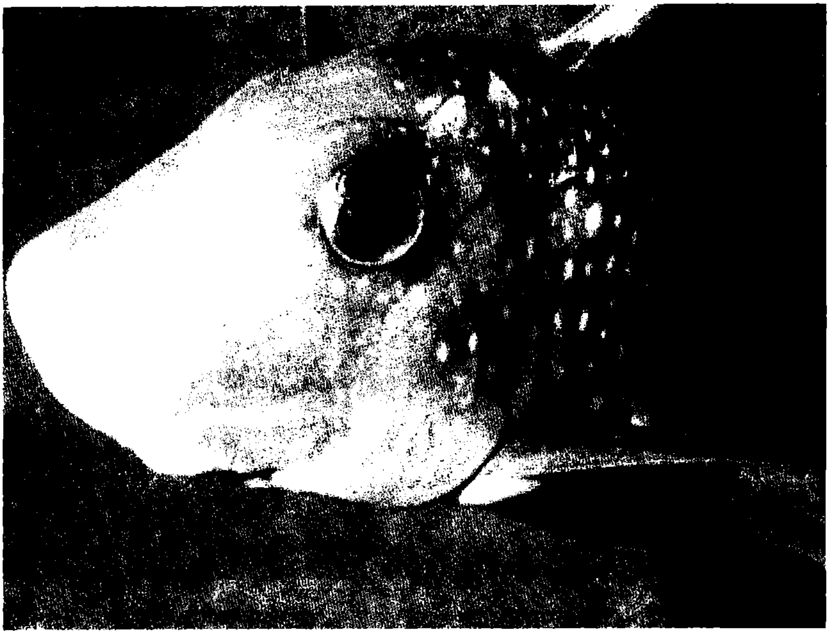

সমুদ্রের এবং পানির সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় ভাগীদার হচ্ছে মাছেরা। মানুষের খাবার হিসেবেও মাছের চাহিদা বড় কম নয়। আর খাদ্য হিসেবে মাছেরা কম পুষ্টিকর নয়। নানা ধরনের ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-ডি এবং প্রোটিন, আয়োডিন ফসফরাস প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান মাছের থেকে আমরা পাই। মিঠে জলের নদী, বা খাল-বিল, পুকুরের প্রায় সব প্রজাতির মাছ মানুষের খাদ্য হলেও কিন্তু খাদ্য হিসেবে বেশীর ভাগটাই আসে সমুদ্র থেকে। প্রতি বছরে কোটি কোটি টন মাছ সমুদ্র থেকে ধরা হয় মানুষের খাদ্য হিসেবে। তবে সমুদ্রের বেশীর ভাগ প্রজাতিই কিন্তু মানুষের খাদ্য নয়। হেরিং, কড্ সার্ডিন, ব[illegible]ফিস স্যামান প্রভৃতি মাছ মানুষের খাদ্য তবে কিছু কিছু প্রজাতির হাঙ্গর প্রভৃতি মাছও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়।

www.pathagar.com

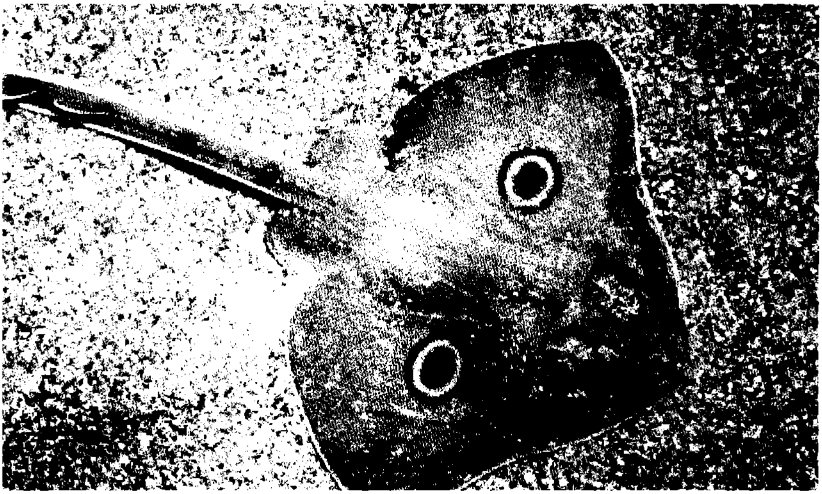

মাছেদের দেহ থেকে বোঝা যায় যে এরা জলে থাকার জন্যই তৈরী হয়েছে। এদের লম্বাটে শরীর, মাঝখানে চওড়া আর দুদিকে ক্রমশ সরু এবং চ্যাপ্টা হওয়ার জন্য এরা বেশ দ্রুত বেগে জলের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে। দুটো চোখ মাথার দুপাশে বসান, যার ফলে এরা দুদিকেই দেখে চলতে পারে জলের মধ্যে সাঁতার কাটার জন্য এদের দুজোড়া পাখনা বা ফিন থাকে দুপাশে ও পেটের নিচে। মাছেদের লেজ চলার সময় হালের কাজ করে– এর দ্বারাই এদিক ওদিক বেঁকতে পারে। তা ছাড়া এদের গায়ে আঁশ বসানো, যা কিনা বর্মতির কাজ করে। মাছ্ নিশ্বাস নেয় কানকোর সাহায্যে

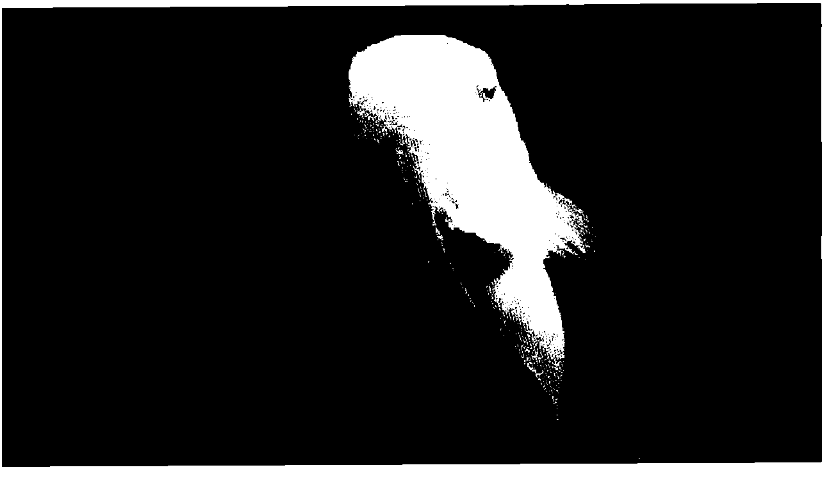

www.pathagar.com

তাই এরা জলের মধ্যে ছড়া থাকতে পারে না। তবে কিছু কিছু প্রজাতির মাছ যাদের লাংফিস বা ফুসফুসওয়ালা মাছ বলে তাদের কানকোর সাথে ফুসফুস থাকার জন্য তারা বাতাস থেকেও অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে। এবার ঈল প্রজাতির মাছের তাদের শরীরের সাথে লেগে থাকা পানি থেকেই অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে। কাজেই এরা ডাঙ্গার উপর ভেজা শরীর নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তবে দেহের পানি শুকিয়ে গেলে এদের আর শ্বাস নেওয়া সম্ভব হয় না ফলে মারা যেতে পারে।

www.pathagar.com

প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য

আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও আরো অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী বিভিন্ন অঞ্চলভেদে বসবাস করে। এই প্রাণীজগত যেমনই বিচিত্র তেমনই কৌতূহল উদ্দীপক। আমাদের চারপাশে সব সময়ই অসংখ্য ধরনের প্রাণী ছড়িয়ে আছে। আমরা যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি কেউ তাতে ভেসে বেড়াচ্ছে; আবার আমরা যে পানি খাচ্ছি কেউ তাতে সাঁতার কাটছে, আবার কেউ কেউ আমাদের শরীরের মধ্যেই বাসা বেঁধে বসে আছে। সত্যি, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে আমাদের শরীরের মধ্যে কত কোটি কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বসবাস করছে। এদের সবগুলোই যে আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক তা কিন্তু নয়। কিছু কিছু আমাদের নানারকম উপকারও করে এবং এদের অনুপস্থিতিতে আমরা রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়ব।

কখনও যদি একফোঁটা খাবার পানি বা আমাদের শরীরের কোন অংশ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে, ঐ অতটুকু জায়গার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ অণু কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। এ তো গেল যাদের চোখে দেখা যায় না। যারা দৃষ্টিগোচর তারাও কি সংখ্যায় কম? এইসব দৃষ্টিগোচর প্রাণীরাও আকৃতি প্রকৃতি সবকিছুতেই একজন আর একজনের থেকে আলাদা।

www.pathagar.com

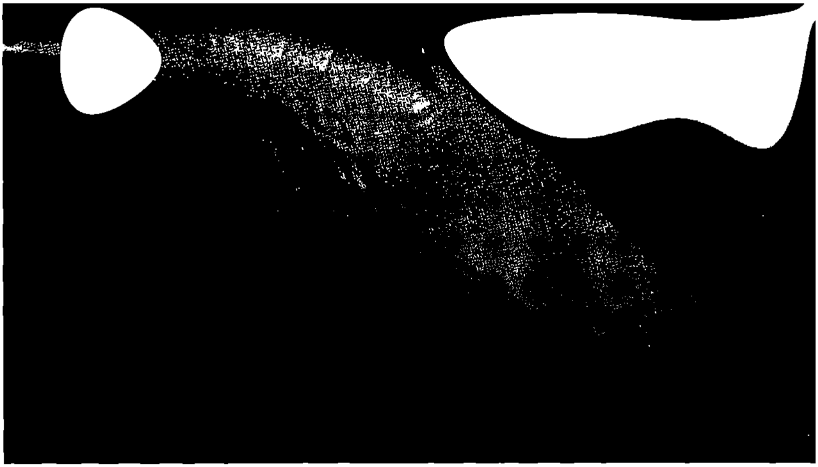

আমরা মানুষেরা অস্তিত্ব রাখার জন্য অনেক প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। আবার সেই সকল প্রাণীরাও তাদের অস্তিত্ব রাখার জন্য আরো কতকগুলো প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। এভাবে তৈরি হয়েছে একটা বিরাট শিকল বা চেইন (Chain)। এখানে সবার জন্যই সবাইকে থাকতে হবে। এই পৃথিবীটা একটা বিশাল বাড়ি। তাতে সবাই-ই একসাথে থাকছে এবং সবারই কিছু না কিছু অবদান আছে। প্রকৃতিতে অদ্ভূত জটিলভাবে এই ভারসাম্য রক্ষিত হয়। মানুষ এই ভারসাম্য নষ্ট করে ফেললে মানুষের অস্তিত্বও অনিশ্চিত হয়ে যাবে। প্রতিটি প্রাণীই তার শারীরিক ক্ষমতা, বুদ্ধি, কাজ অনুসারে আলাদা আলাদা প্রাকৃতিক পরিবেশের

www.pathagar.com

মধ্যে বাস করে। সেই অনুসারে তাদের মধ্যে দেখা যায় আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। যেমন জলজ প্রাণী প্রধানতঃ ফুলকার সাহায্যে নিঃশ্বাস নেয়। আর ডাঙার প্রাণী নেয় ফুসফুসের সাহায্যে। আবার ডাঙার প্রাণী চলাফেরা করে মূলত পা-এর সাহায্যে, আর পাখি বা আকাশের প্রাণীরা চলাফেরা করে ডানার সাহায্যে। উড়তে সুবিধার জন্য পাখির শরীরের ওজন হয় হালকা। তেমনি প্রজাপতির গায়ের রং হয় ফুলের মতো চিত্র-বিচিত্র যাতে এরা প্রাণ ধারনের জন্য সহজেই ফুলের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারে। ঘাস ফঁড়িংয়ের রং হয় একদম ঘাসের মতো। ঘাসের মধ্যে বসে থাকলে এদের আলাদা করে চেনাই যাবে না। আবার কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা প্রয়োজন মতো গায়ের রং বদলাতে পারে।

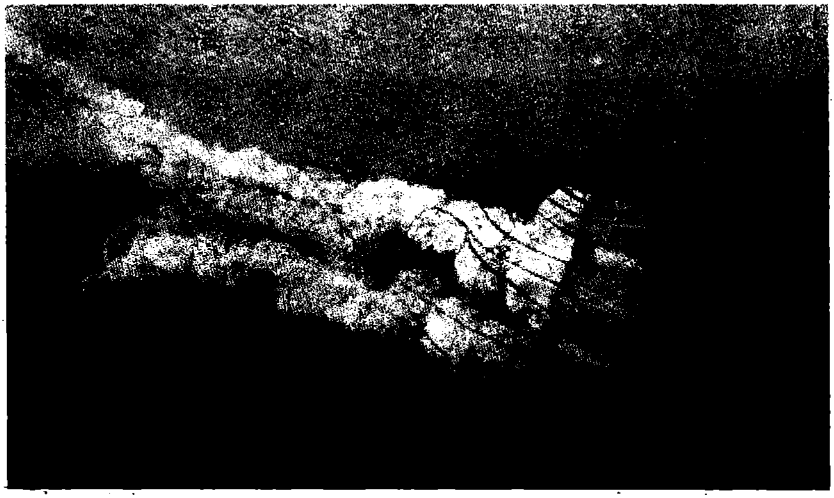

সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন হয়েছে। যেসব প্রাণী এই পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের আস্তে আস্তে পরিবর্তিত করেছে বা করতে পেরেছে তারা বহুকাল ধরে পৃথিবীতে টিকে আছে। আর যারা পারেনি তারা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এই সব প্রাণীর কথা আমরা এখন জানতে পরি তাদের ফসিল থেকে।

বিচিত্র এই পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক প্রাণীদের আরও বিচিত্র তথ্যাবলী চিত্রসহ তোমাদের সামনে তুলে ধরা হলো।

এবার চলো আমরা জেনে নিই সমুদ্রের গভীর এবং অগভীর অঞ্চলে বিচিত্র ভুবনে বসবাসকারী দুর্লভ কিছু মাছের জীবন সম্পর্কে। সমুদ্রের পানিতে যেমন ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়া জাতীয় শক্ত খোলসের ছোট ছোট জীব

www.pathagar.com

আছে, তেমনি কাদার মতো নরম জেলিফিশ, তারা মাছ আর পাঁচ-সাত মণ ওজনের বিরাট বিরাট মাছও আছে। এছাড়া ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা তিমি, শার্ক, হাঙ্গর, উড়ুক্কু মাছ, অক্টোপাস বিদ্যুতের মত শক্ মারা ইল মাছও আছে।

সামুদ্রিক মাছের প্রজাতি

মাছের শরীরের হাওয়া ভরা পটকা কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করে। পানির গভীরে যাওয়া বা পানির উপরে আসা এই পটকার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পটকায় হাওয়ার পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় এদের শরীর তত ফুলে ওঠে ও হালকা হয়ে যায় ফলে এরা ক্রমশ পানির উপরে ওঠে আসে। অন্যদিকে পটকায় হাওয়ার পরিমাণ যত কম হয় এদের দেহের ওজন আকৃতির তুলনায় তত কম হয়ে থাকে ফলে এরা ক্রমশ পানির নীচের দিকে নেমে যেতে থাকে। মাছ পটকাতে ইচ্ছামতো এই হাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়ে পানির উপরে বা নীচে যায়।

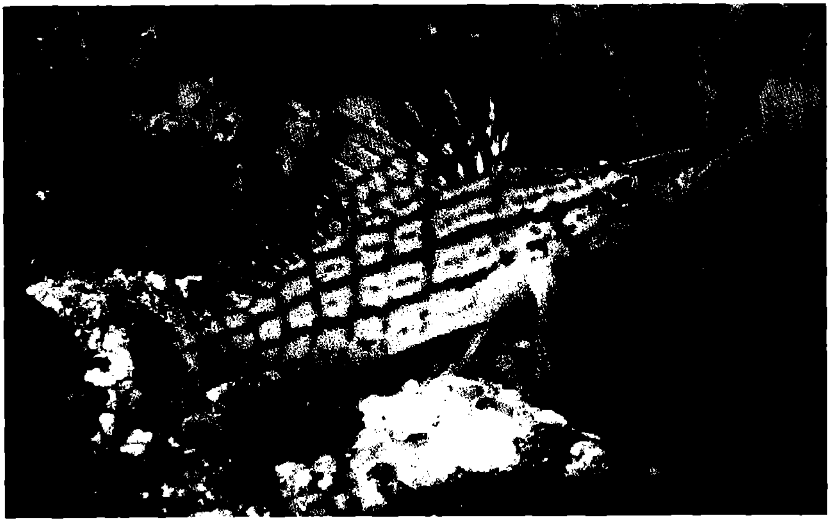

বেশ কিছু প্রজাতির মাছ মানুষের খাদ্য। আবার অনেক প্রজাতির মাছ যেমন গোল্ডফিস, মলি, আঞ্জলমাছ, সাম্পি প্রভৃতিকে মানুষ বাড়ীতে এ্যাকুরিয়ামে পোষে। তবুও কিছু কিছু মাছ আছে যারা মানুষের শত্রু। এই ধরনের মাছের কথা উঠলেই অনিবার্য ভাবে প্রথমেই মনে আসে হাঙরের কথা এদের দুপাটি দাঁতের জোর এত বেশী যে এরা অনায়াসে একটা

www.pathagar.com

মানুসকে কামড়ে দুটুকরো করে ফেলতে পারে। পানির মধ্যে এরা অনেক দূর থেকে রক্তের গন্ধ পায়। কোন ভাবে শিকারের সন্ধান পেলে এরা তাকে ধরবার জন্য অনুসরণ করে রাখে। তবে বাস্কির শার্ক, সবচেয়ে বড় জাতের হাঙর হোয়েল শার্ক যা এক একটা পঞ্চাশ ষাট ফুট বড় হয়, বা নার্স শার্করা কিন্তু বেশ নিরীহ হাঙর, মানুষের কোন ক্ষতি করে না। আসলে ওদের দাঁত এত ছোট হয় যে ছোট ছোট প্রাণী ছাড়া অন্য কিছু এরা খেতে পারে না। আবার নার্স শার্ক এত নিরীহ যে অনেক সময়ই সমুদ্রের সাঁতারুরা এদের পিঠে চেপে বসে। এদের ফ্লোরিডার কাছাকাছি পাওয়া যায় এবং প্রায়শই এরা অগভীর চলে চলে আসে।

দক্ষিণ আমেরিকায় নদীতে এক ধরনের ছোট ছোট মাছ পাওয়া যায় যাদের নাম পিরানহা। এরাও কিন্তু ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির হয়। এদের ঝাঁকে একবার কোন প্রাণী পড়লে আর নিস্তার নেই। দল বেঁধে আক্রমণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে শেষ করে ফেলে। বিশেষ করে জলে একবার রক্তের গন্ধ পেলেই হয়। ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসবে সেখানে। আবার ব্যারাকুডা, ওরয়গেস্, প্যারট, মাছেরা বেশ বিশাক্ত হয়। এই সব মাছ খেয়ে অনেকেই বিষক্রিয়ায় মারা গেছে। আবার স্টোনফিশ, লায়নফিস প্রভৃতির

www.pathagar.com

কাঁটার আঘাতে বেশ যন্ত্রনাদায়ক ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। তাই সাঁতারুরা সব সময় এদের এড়িয়ে চলে।

সোর্ডপি বরা তরোয়াল মাছ আর করাত মাছেরাও মানুষের খুব একটা বন্ধুভাবাপন্ন নয়। এরা তরোয়ালের মতো ঠোঁট দিয়ে ডান্ডা মেরে ছোট জাহাজ বা নৌকার তলা ফাটিয়ে দিতে পারে। করাত মাছের ঠোঁটটা আবার করাতের মতো খাঁজকাটা। কিছু কিছু মাছের আবার লেজটা চাবুকের মতো। তাতে কাঁটা বসানো থাকে অনেক সময়। এই চাবুকের মতো লেজ দিয়ে এরা আত্মরক্ষা করে। শঙ্কর মাছ এই ধরনের মাছ।

স্টার ফিশ

এই মাছের চেহারা অনেকটা স্টার বা তারার মত বলেই এই মাছের নাম দেয়া হয়েছে স্টার ফিশ। তবে মাছ বা ফিশ হবার মতো তেমন কোন বাড়তি যোগ্যতা এই প্রাণীর নেই। কারণ, স্টার ফিশের কোনো মস্তিষ্ক নেই। ওরা একধরনের স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমেই যাবতীয় কাজ করে থাকে। এই কারণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় স্টার ফিশ আসলে মাছ নয়। পানির নিচে থাকে বলেই তাদেরকে আদর করে তাদেরকে স্টার ফিশ বলে ডাকা হয়

www.pathagar.com

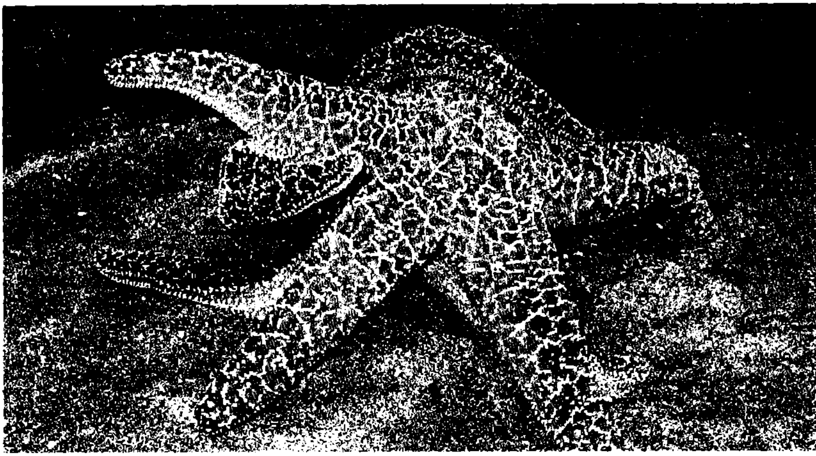

এরা সাধারণত সমুদ্রের অগভীর পানিতে বসবাস করে। তবে বিশেষ প্রজাতির কিছু স্টার ফিশ সমুদ্রের গভীর পানিতেও দেখা গেছে।

অনেকসময় জোয়ার সরে গিয়ে ভাটার সময় অগভীর খাঁড়িতে বা পানিতে স্টার ফিশ আটকা পড়ে যায়। জোয়ারের পানির টানে এগুলো কিনারায় চলে আসে। আবার জোয়ার সরে গেলে এগুলো সমুদ্রের কিনারায় আটকে থাকা স্বল্প পানিতে আটকা পড়ে যায়। এইসময় স্টারফিশ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। তবে এর মধ্যে মাছের তেমন কোন বাহ্যিক পদার্থ না থাকার কারণে এগুলোকে সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা কঠিন। এক ধরনের রাসায়নিক

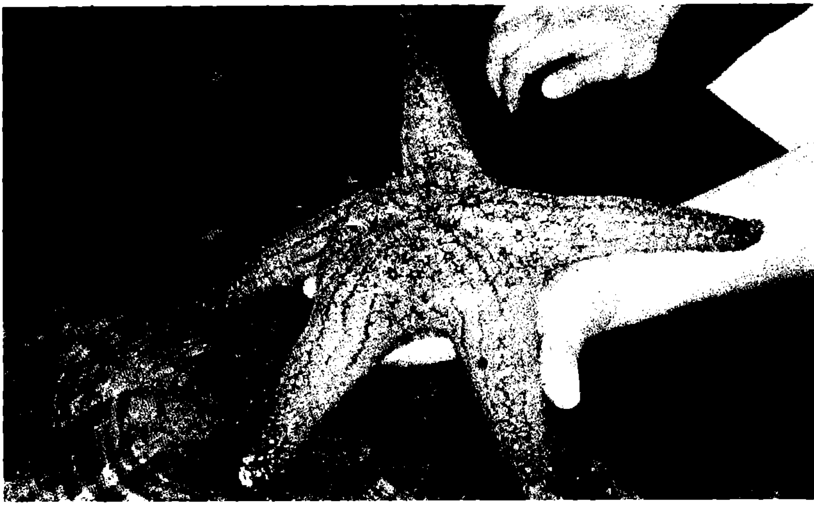

www.pathagar.com

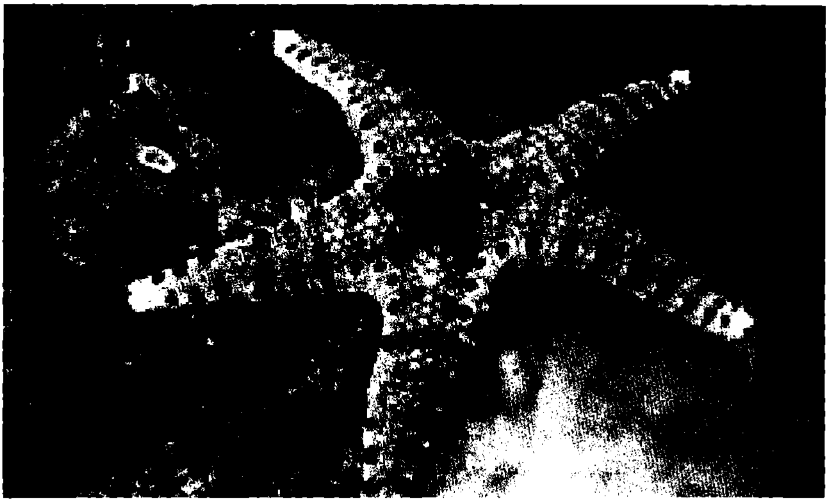

পদার্থ ব্যবহার করে সংরক্ষিত স্টার ফিশ সমুদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে কিনতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন ইত্যাদি অঞ্চলের বিভিন্ন ঝিনুক বিক্রেতার কাছে রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত স্টার ফিশ কিনতে পাওয়া যায়।

শার্ক বা হাঙর

সমুদ্রের সবচেয়ে শক্তিমান মাছ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় হাঙর বা শার্ক জাতীয় মাছকে। আকারে খুব বেশি বড় না হলেও সমুদ্রের রাজা নামেও এই মাছকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কারণ, এটা এমন এক ধরনের খাদক মাছ। যাদের কাছে নিজেদের গোত্র ছাড়া (মাঝে মাঝে তাও খায়) বাকি

www.pathagar.com

যাবতীয় সামুদ্রিক প্রাণী তার আহার্যের বস্তু। মানুষ জাতীয় প্রাণী (অভ্যস্ত হয়ে গেলে) তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার। তবে চলচ্চিত্রে হাঙ্গরকে যতটা ভয়ঙ্করভাবে দেখানো হয় বাস্তবে ততটা না হলেও নিঃসন্দেহে এটি একটি নোংরা খুনী। হাঙ্গর দ্বারা বছরে প্রায় ১০০টির মতো দুর্ঘটনা ঘটে। সমুদ্রে কয়েক প্রজাতির হাঙ্গর দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে কয়েকটির নাম দেয়া হলো।

মাছ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে, ৬৫/৭০ ফুট লম্বা হোয়েল শার্ক। এদের মুখটা ব্যাঙের মতো বীভৎস আর খয়েরী গায়ে থাকে সাদা সাদা ছিট ছিট।

পানির দানব গ্রেট হোয়াইট শার্ক

একটা হোয়াইট শার্ক যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে আশেপাশে তার প্রায় ১০-১২ জন ভাই-বোন দেখতে পায়। জন্মের পর তাকে সাঁতরে মার কাছ থেকে চলে যেতে হয়। শুরু থেকেই বাচ্চা শার্কদের নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়।

www.pathagar.com

মা-বাবারা তাদের বাচ্চাদের নিজেদের শিকার হিসেবেই চেনে। জন্মের সময় একটা হোয়াইট শার্ক প্রায় ৫ ফুট (দেড় মিটার) লম্বা থাকে, বৃদ্ধির সাথে সাথে এটা সর্বোচ্চ প্রায় তিনগুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে। বাচ্চা শার্কদের পাপ (PUP) বলা হয়। এরা সমুদ্রের উপরিভাগের খাদ্যশৃঙ্খলে বসবাস করে। সমুদ্রের যত ধরনের শিকারী মাছ আছে, তাদের ভেতর গ্রেট হোয়াইট শার্ক সবচাইতে বড় এবং শক্তিশালী। কিন্তু বড় না হওয়ার আগ পর্যন্ত পাপগুলোকে তাদের চাইতে আকারে বড় শিকারী মাছদের থেকে দূরে দূরে থাকতে হয়। অধিকাংশ বাচ্চা শার্ক জন্মের প্রথম বছর টিকতে পারে না।

বেড়ে উঠা শার্ক বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় মাছ খায় (ছোট শার্ক সহ)। আরো বেড়ে উঠার সাথে সাথে সামুদ্রিক বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী (যেমন সি লায়ন, সীল ইত্যাদি) তাদের প্রিয় শিকারে পরিণত হয়।

শার্ক মাছের শিকারের স্টাইল খুবই আশ্চর্যজনক। যেমন সমুদ্রের উপরিভাগে কোনো 'সীল' ভাসতে দেখলে শার্ক ঠিক তার নিচে যেয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর হঠাৎই দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায় শিকারের দিকে তারপর পানির উপর লাফিয়ে উঠে শিকার মুখে নিয়ে তারপর চলে যায় পানির নিচে।

শার্ক কখনো তার খাবার চিবোয় না, মাংস ছিড়ে বের করে এনে সম্পূর্ণটাই গ্রাস করে ফেলে। একটা 'সীল' বা 'সী লায়ন' খাওয়ার পর এক মাস অথবা দুই মাস শার্ক বড় কোন খাবার না খেয়ে থাকতে পারে।

www.pathagar.com

যাই হোক, সমুদ্রের যে অংশে শার্ক বসবাস করে সে অংশে তারই রাজত্ব। অন্য কোন প্রাণী সেখানে ভেসে আসতে পারে না।

গ্রেট হোয়াইট শার্ক-এর অজানা তথ্য

* White Shark-এর বৈজ্ঞানিক নাম Carcharodon carcharias.

* কিছু শার্কের ওজন সাড়ে চার হাজার পাউন্ডেরও বেশি হতে পারে (২০০০ কেজি)।

* হোয়াইট শার্ক ছাড়াও অন্যান্য শার্ক যেগুলো মানুষের জন্য বিপজ্জনক তারা হলো tiger sharks Ges bull sharks.

* শার্কদের শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি আর ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীব্র। এইসব ইন্দ্রিয় ব্যবহার করেই তারা শিকার করে।

* শার্কদের লিভার খুবই বড়, মোটা এবং তৈলাক্ত, যা তাদেরকে পানিতে ভেসে থাকতে এবং দ্রুত চলাচলে সাহায্য করে।

সামুদ্রিক মাছের মধ্যে সবচেয়ে বড় মাছ হিসেবে হোয়েল শার্ক (Whale Shark)-কে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। একটি পরিণত হোয়েল শার্ক লম্বায়

www.pathagar.com

প্রায় ১৪ মিটার এবং ওজনে ২২,০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত পাওয়া গেছে। গবেষকরা ধারণা করেন এর চেয়েও বেশি ওজনদার এবং বেশি দৈর্ঘ্যের হোয়েল শার্ক রয়েছে সমুদ্রের গভীরে।

বামবো শার্ক

ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম পাপুয়ার সেন্ডিরাওয়াসিহ বেতে ২০০৬ সালে এই হাঙ্গরটি খুঁজে পাওয়া যায়।

এই এলাকার প্রবালশ্রেণীতে এত উঁচু মাত্রার জীববৈচিত্র্য আছে যে গবেষকরা এলাকাটিকে 'বিভিন্ন প্রজাতির কারখানা' নামে অভিহিত করে থাকেন। মার্ক এর্ডম্যান নামের একজন গবেষক ২০০৬ সালে এই নতুন প্রজাতির হাঙ্গরটি খুঁজে পান।

যদিও প্রয়োজনে এরা সাঁতার কাটতে পারে। সাধারণত শৈলশ্রেণীতে হাঁটার জন্য এবং প্রবালের মধ্য থেকে খাওয়ার জন্য এরা বুকের পাখনা ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীরা এই নতুন হাঙ্গরটি নামকরণের স্বত্ব নিয়ে নিলাম ডেকে সমুদ্রের প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন।

নার্স শার্ক

সাধারণ হাঙ্গরের মতো এদের মুখ লম্বা নয় বরং এদের মুখ বেশ গোলাকার। দাঁতগুলোও ছোট ছোট। এই হাঙ্গরের শক্তিশালী চোয়াল কঠিন বস্তু গুঁড়ো করে দিতে পারে কিন্তু ছিঁড়তে পারে না। তাই এই নার্স শার্ক যখন কোন জিনিস কামড়ে ধরে তখন তাদের চোয়াল বিরাট সাঁড়াশির মতো এমনভাবে জিনিসটাকে চেপে ধরে যে, যতক্ষণ প্রাণীটিকে মেরে ফেলা হচ্ছে ততক্ষণ তার মুখ ফাঁক হবে না। একবার Florida উপকূলে কিছু মানুষের মৃতদেহ পানিতে ভাসতে দেখা গিয়েছিল। সেই দেহগুলো পরীক্ষা করে ডাক্তাররা বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। কারণ দেহগুলো রক্তশূন্য ছিল। দেহগুলোর উপরকার মাংসপেশীর আঘাত অতটা মারাত্মক ছিল না কিন্তু এদের দেহের ভিতরের সমস্ত হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এগুলো সবই ছিল নার্স শার্কের কীর্তি।

www.pathagar.com

স্যান্ড শার্ক

আটলান্টিক হো সাগরের দুই পাশের অঞ্চলে এই হাঙ্গর প্রচুর দেখা যায়। পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকে ক্যানারি, Florida ও ব্রাজিলের সমুদ্র

উপকুল এদের মূল বিচরণক্ষেত্র। অন্যান্য হাঙ্গরের থেকে এদের প্রধান পার্থক্য এরা নিজেদের পাকস্থলীতে বাতাস ধরে রাখতে পারে। যেখানে অন্যদের দেহে বায়ুথলি বা পটকা না থাকায় তাদের পানিতে ভাসবার জন্য সবসময় লেজ নাড়াতে হয়। কিন্তু স্যান্ড শার্ক লেজ চালনা না করেই পানিতে ভাসে। স্যান্ড শার্ক পানির একেবারে তলায়ও যেমন যায় তেমনই এরা মাঝে মাঝে ডাঙ্গার কাছাকাছি থেকে শিকার টেনে নিয়ে গভীর পানিতে চলে যায়।

বুল শার্ক

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বুল শার্কের দেখা মিলবে। বিভিন্ন অঞ্চলে এরা বিভিন্নভাবে পরিচিত। যেমন মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়ার হ্রদে যারা থাকে

www.pathagar.com

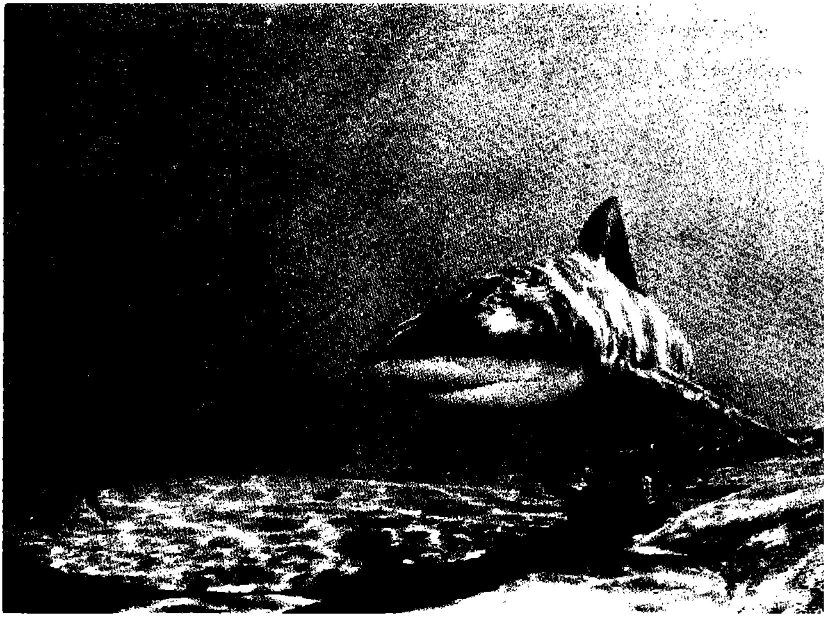

তাদের নিকারাগুয়া শার্ক বলে। সাগর থেকে যারা গঙ্গা নদীতে আসে তাদের গঙ্গা শার্কও বলে। বুল শার্করা হিংস্রতায় অন্যান্য হাঙ্গরের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। গোসল করতে আসা মানুষদের এরা গভীর পানির তলায় টেনে নিয়ে গিলে ফেলে।

বাঘা হাঙ্গর বা টাইগার শার্ক

বাঘা হাঙ্গরকে ইংরেজীতে বলে টাইগার শার্ক। তার বাঘের মতো হিংস্র স্বভাব ও গায়ে ডোরাকাটা দাগ। এই হাঙ্গর যখন জন্মায় তখন এদের দেহের কালো ডোরাকাটা দাগ উজ্জ্বল থাকে, তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ক্রমশ ফ্যাকাসে হতে থাকে। লম্বায় এরা প্রায় ২৪ ফুট। প্রধানত উষ্ণ অঞ্চলের সাগর উপকূলে এদের দেখা যায়। এই বাঘা হাঙ্গরের বৈশিষ্ট্য হলো এদের চোয়াল এমন আলগা করে লাগানো থাকে যে, এরা প্রায় তাদের নিজেদের আকারের শিকারকে পর্যন্ত গিলে ফেলতে পারে। অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে ১৯৫১ সালে আমেরিকার উত্তর অ্যারিজোনা অঞ্চলে। সেখানে জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে দেখে তাদের জালে একটা বাঘা হাঙ্গরের মৃতদেহ উঠেছে। জেলেরা হাঙ্গরের পেটটা করাত দিয়ে কাটে। তখন দেখে একটা মানুষের পচাগলা মৃতদেহ। পরে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছিলেন, দেহটার

www.pathagar.com

ওপরের অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও দেহের হাড়গুলো সম্পূর্ণ অক্ষত। এর থেকে প্রমাণিত হয়েছিল বাঘা হাঙ্গরটা পুরো মানুষটাকে আস্ত গিলে ফেলতে পেরেছিল।

হ্যামার হেড শার্ক

দুই মাথাওয়ালা হাতুড়ির মতো হ্যামার হেড শার্কের মাথাটা অদ্ভুত গড়নের। বিশাল একটা কাঠের পুরু তক্তার মতো। তার দুই প্রান্তে দুইটি চোখ এবং নাসারন্ধ্র। এই হাঙ্গরের নাকে দূর থেকে রক্তের গন্ধ পৌঁছে।

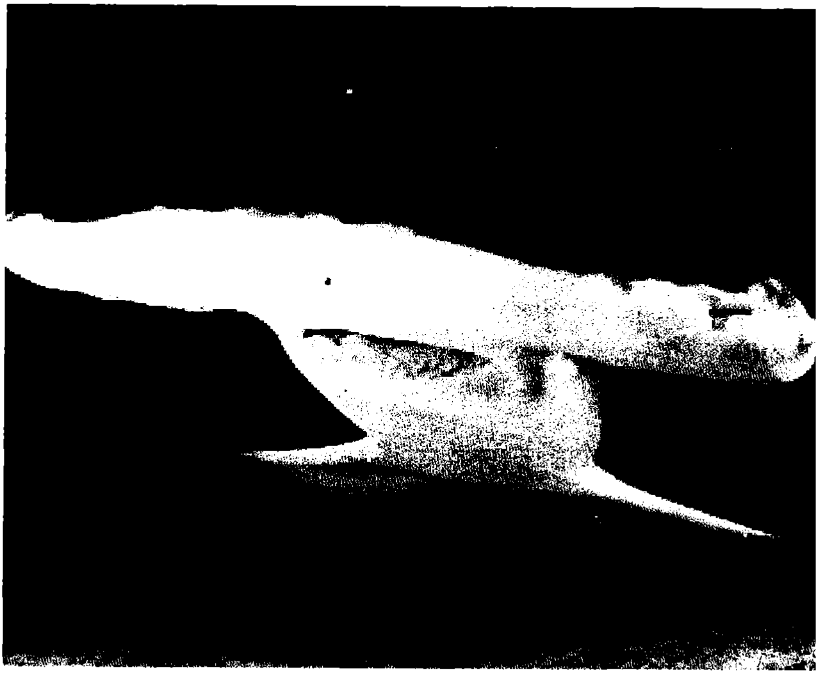

সমুদ্রের কোনো প্রাণী বা ডুবুরির দেহ থেকে রক্ত বের হলে এবং সেই রক্তের গন্ধ পেলে প্রাণীটিকে চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে হ্যামার হেড শার্করা এসে ঘিরে ধরে। এদের মাথার দুই প্রান্তে দুইটি চোখ থাকায় সামনের দিক এবং দুই পাশের দিক দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না। এদের প্রধানত আটলান্টিক মহাসাগরে বেশি দেখা যায়।

www.pathagar.com

থ্রেসার শার্ক

থ্রেসার শার্কের দেহের গড়ন অদ্ভুত। তার দেহ যতখানি লম্বা প্রায় ততখানিই লম্বা তার লেজ। থ্রেসার শার্কের শিকার ধরার পদ্ধতি এই লেজের মাধ্যমেই হয়। মাছের ঝাঁক দেখতে পেলেই এই শার্ক ছুটে গিয়ে লেজের ঝাপটা দিয়ে পানি ছিটিয়ে মাছের ঝাঁককে এক জায়গায় জড়ো করে, তারপর

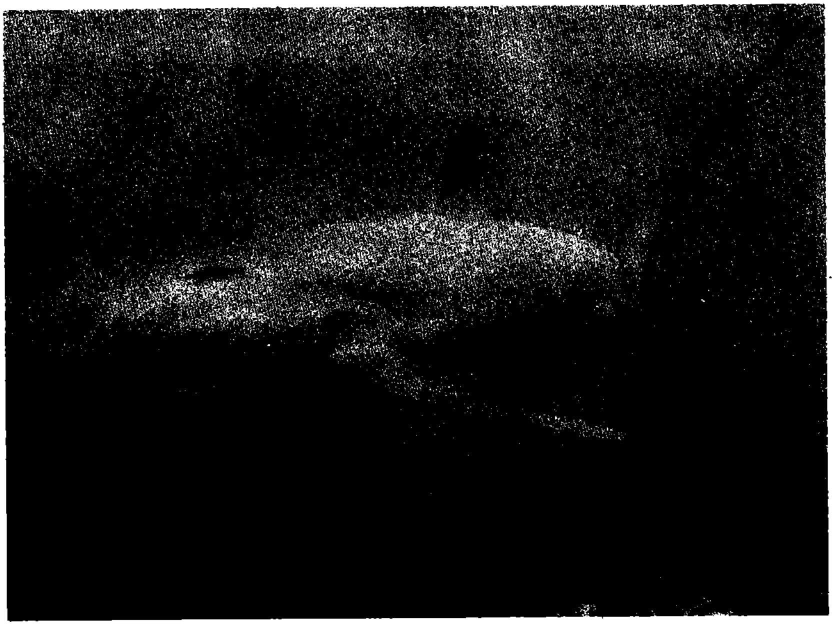

চলে তার রাক্ষুসে আহার। একসঙ্গে প্রায় ১৫ থেকে ১৭০টি মাছ খেয়ে ফেলে এই হাঙ্গর। জেলেরা যখন জাল দিয়ে মাছ ধরে, থ্রেসার শার্ক যদি তা দেখতে পায় তাহলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং জালসুদ্ধ সব মাছ খেয়ে ফেলে।

গ্রেরিফ শার্ক

গ্রেরিফ শার্কের নামকরণ হয়েছে তাদের দেহের ধূসর বর্ণ থেকে। এই হাঙ্গর সাধারণত প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের বাসিন্দা। উপকূলের কাছাকাছি কোন মানুষকে সাঁতার কাটতে দেখলে এই হাঙ্গর চুপিসারে তাকে নিখোঁজ করে দেয়। মেক্সিকো উপসাগরের উষ্ণ অঞ্চলে পানির গভীরে ডুবো পাহাড়ের গুহায় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। গুহার মধ্যে এরা নিশ্চল হয়ে

www.pathagar.com

শুয়ে থাকে। গুহার মধ্যে থাকলেও তাদের চোখ কিন্তু অনবরত ঘোরে, কোন প্রাণী একটু অসতর্ক হলেই, সে নিঃশব্দে চলে যায় গ্রেরিফ শার্কের পেটে।

হোয়াইট টিপ শার্ক

এই হাঙ্গরের নামকরণ হয়েছে তাদের পাখনার সাদা রং থেকে। এরা মূলত উষ্ণ সাগরের বাসিন্দা। তবে মেক্সিকো উপসাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে এদের বেশি দেখা যায়। এই হাঙ্গর যখন সাঁতার কাটতে

কাটতে এগিয়ে যায় তখন এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় পাইলট নামের মাছেরা। আর রিমোরা বলে একপ্রকার প্রাণী আছে যারা এই হোয়াইট টিপ শার্কের দেহের সঙ্গে নিজেদের চোষক যন্ত্রের সাহায্যে শক্তভাবে আটকে থাকে।

কোরাল নামের প্রাণী

সাগর তলের দুনিয়ায় কত কিছুই ঘটছে। হাজার জাতের উদ্ভিদ, হাজার জাতের প্রাণী আছে সাগরে। সাগরের পরিবেশও বৈচিত্র্যময়। এসব নিয়ে সাগরের বুকে ঘটছে নানা পরিবর্তন। সাগর তলের সৌন্দর্যের কোনো তুলনা হয় না। এ সৌন্দর্যের জন্য কোরালের নাম সবার আগে উচ্চারিত হয়ে থাকে। কোরাল এক ধরনের অমেরুদণ্ডি প্রাণী। সিলেন্টারাটা পর্বভুক্ত। বর্ণিল

www.pathagar.com

এ প্রাণী সাগররত্ন নামেও পরিচিত। কোরাল সমাজবদ্ধ জীব। সারাজীবন যারা একসঙ্গে বসবাস করে, মরণেও তারা একতাবদ্ধ থাকে। মৃত কোরালও এক ধরনের পরিবর্তনে অংশ নেয়।

মৃত কোরালের দেহ স্তূপাকারে জমা হয়ে নানা আকৃতির কাঠামো তৈরি করে। উদাহরণ হিসেবে কোরাল রিফ, কোরাল ব্যাঙ্কের (বাঁধাকৃতি) নাম গুরুত্বপূর্ণ। তবে এদের মূল উপাদান অভিন্ন। এরা কার্বোনেট অব লাইম নিয়ে তৈরি। এছাড়া অন্যান্য প্রাণীর অংশ, শৈবালও দেখতে পাওয়া যায়। কোরাল রিফ অথবা কোরাল ব্যাঙ্ক গঠন নির্ভর করে সাগরের পরিবেশের ওপর। বিশেষ করে তাপমাত্রা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের উপস্থিতির মাত্রার ওপর নির্ভরশীল।

কোরাল রিফ

পাথুরে কোরাল দিয়ে কোরাল রিফ তৈরি। কোরাল রিফ সাধারণত ট্রপিক্যাল সাগরে গঠিত। ট্রপিক্যাল সাগরে অগভীর অঞ্চলে এদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি। কোরাল রিফ গঠনে আদর্শ তাপমাত্রা (২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)-এখানে সব সময় বজায় থাকে। একই কারণে সাধারণত ১১ মিটার হতে ৪০ মিটার গভীর সাগর অঞ্চলে এদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। রিফকে সাধারণত উপর দিকে বাড়তে দেখা যায়।

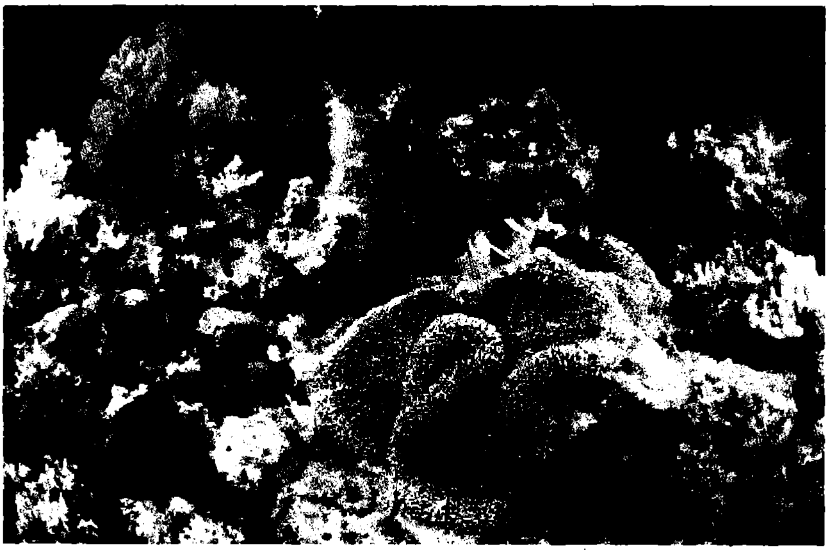

www.pathagar.com

কোরাল ব্যাঙ্ক

সাগরের গভীরে আরেক ধরনের কোরাল জন্মে। ৬০ মিটার হতে ২০০ মিটার গভীর সাগর অঞ্চলে এরা বেঁচে থাকে। ৪ ডিগ্রি থেকে ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এদের খুবই উপযোগী। এ ধরনের কোরালের মৃতদেহ রিফ না গঠন করে ব্যাঙ্ক গঠন করে।

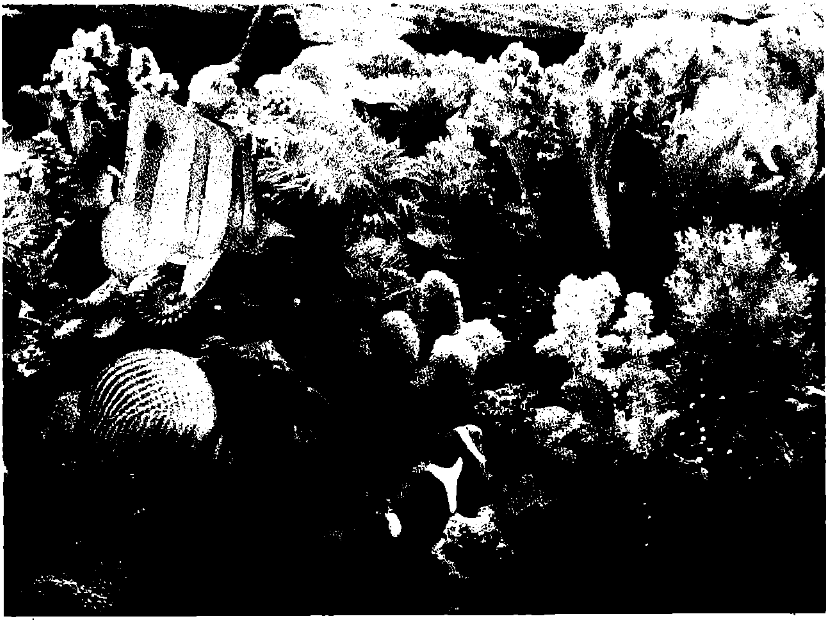

ব্যাঙ্কগুলো উচ্চতায় খুব একটা বাড়ে না। এদের বৃদ্ধি বরং দৈর্ঘ্য বরাবর অনেক বেশি। নরওয়ে থেকে কেপ ভার্দের কূল বরাবর ইস্টার্ন আটলান্টিক শেলফ এজ এদের উৎপত্তিস্থল। এছাড়া নাইজার নদীর বদ্বীপ অঞ্চল, মেক্সিকো উপসাগর, নিউজিল্যান্ডে ক্যাম্পবেল মালভূমি ও শাথান রাইজ, জাপানের কাছে উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরেও এই ধরনের কোরাল পাওয়া যায়। এদের মৃতদেহ কোরাল ব্যাঙ্ক গঠন করে।

এছাড়া আধুনিক সাগরগুলোতে আরো এক ধরনের কোরাল জন্মে। এরা আরো গভীর আর শীতলতার উপযোগী। এন্টার্কটিকা, পাতাগোনিয়া, ফকল্যান্ড দ্বীপে এদের দেখা যায়। এখানে তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সে. থেকে ৬ ডিগ্রি সে. সীমাবদ্ধ থাকে। তবে অধিকাংশ কোরালই রিফ গঠন করে।

www.pathagar.com

রিফ যেভাবে গড়ে ওঠে

ট্রপিক্যাল সাগরে কোরাল রিফ গঠিত হয়। এ ধরনের সাগরে তাপমাত্রা রিফ গঠনকারী কোরালের জন্ম ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য উপযোগী। সাগরের পানিতে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা থাকে বলে প্রচুর phytoplankton জন্মে। phytoplankton হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ।

phytoplankton খেয়ে জু-plankton (ক্ষুদ্র প্রাণী) বেঁচে থাকে। কোরালের প্রধান খাদ্য zooplankton। যথাযথ পরিমাণ zooplankton থাকে বলে গ্রেট বেরিয়ার রিফ গঠন সম্ভব হয়েছে। গ্রেট বেরিয়ার রিফ গঠনে সাগর পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

এখানে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ খুব বেশি, সম্পৃক্ততার কাছাকাছি। কোরাল রিফ সাধারণত বেশি গভীরতায় গঠিত হয় না। এর মূলে আছে একটা বিশেষ সম্পর্ক। যেমন, সাগরের গভীরতা বৃদ্ধি পেলে আলোর স্থায়ীত্ব কমে যায়। মাকেরিয়া আইল্যান্ডসে (The Maderia Islands) মার্চ মাসে ২০ মিটার গভীরতায় আলো থাকে ১১ ঘণ্টা, ৩০ মিটারে ৫ ঘণ্টা, ৪০ মিটারে মাত্র ১৫ মিনিট। অবশ্য আলোর উপস্থিতি তার অক্ষাংশের ওপর নির্ভরশীল।

রিফ গঠন প্রক্রিয়া

রিফ গঠনে সাগরে ভূ-প্রাকৃতিক গঠন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি কথা বললে কোরাল রিফ তৈরির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এখনো মানুষের অজানা। এর

www.pathagar.com

গঠন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। পৃথিবীর বহিরাঞ্চলের গঠন প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। কোথাও চাপের আধিক্যে পর্বাঞ্চল তৈরি হচ্ছে, আবার কোন অঞ্চল সাগরে ডুবে যাচ্ছে। সাধারণত ৩ ধরনের রিফ দেখা যায়। বেলা শৈল (Frinnging reef), প্রবাল প্রাচীর (Barrir reef), অ্যাটল। সাগরতলেও অনেক সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে। ভূ-অভ্যন্তরস্থ চাপের কারণে অনেক সময় এরা পানি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। এই অবস্থায় কোরাল বিভিন্ন ধরনের ও আকৃতির শৈল গঠন করে। একসময়ে এই ধরনের আগ্নেয়গিরি মারা যায়

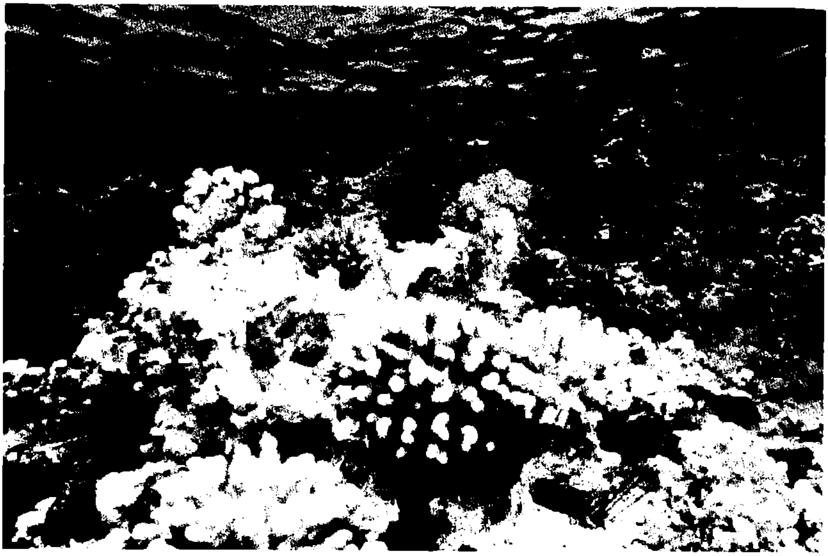

এবং সাগরে ডুবে যেতে শুরু করে। ডুবুডুবু অবস্থায় প্রবাল প্রাচীর তৈরি হয়। সম্পূর্ণ ডুবে গেলে অ্যাটল তৈরি হয়। রিফে যেসব বস্তু থাকে তার মধ্যে লাইম অব কার্বোনেট তো অবশ্যই পাওয়া যায়। এছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম, স্ট্রনসিয়ামের মতো ধাতুও অল্প পরিমাণ থাকে। আরো আছে ম্যাঙ্গানিজ, লোথ ইত্যাদি। তবে স্বল্প পরিমাণ (পিপিএম) দেখা যায়। স্থানভেদে আরো বিশেষ কিছু উপাদান থাকে। উদাহরণস্বরূপ, প্রশান্ত মহাসাগরের কোরালে ২.১৭ পিপিএম ইউরেনিয়ামও পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন দেশের পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সাগরের এই সৌন্দর্য ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া, সাগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টির সাথে মানুষের হস্ত ক্ষেপ খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার। সাগরের এ সৌন্দর্য রক্ষা করা একান্ত ই কাম্য।

www.pathagar.com

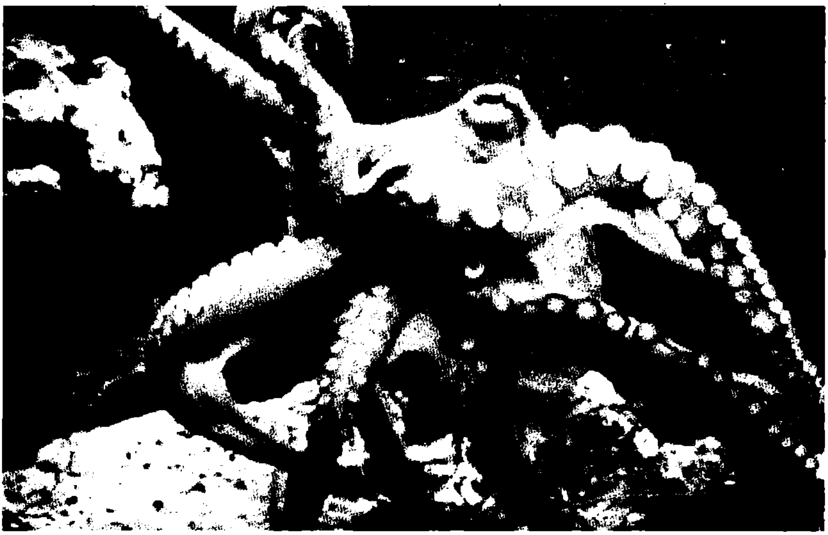

আজব প্রাণী অক্টোপাস

অক্টোপাস খালি চোখে না দেখলেও কিছুদিন আগে বিশ্বকাপ ফুটবলের হিরো হয়ে গিয়েছিল একটি অক্টোপাস। তখনই সারাবিশ্বের মানুষ অক্টোপাসকে দেখেছিল টেলিভিশনের পর্দায়। ফুটবল খেলার ভবিষ্যদ্বানী করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল অক্টোপাসটি।

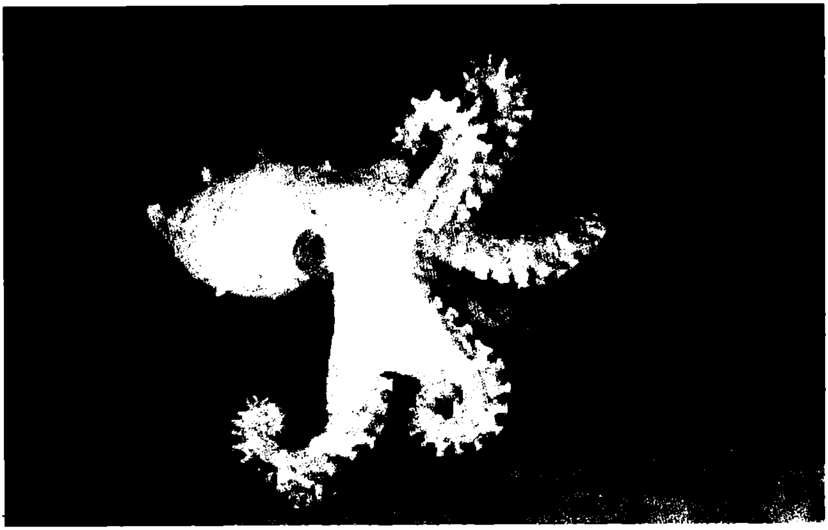

www.pathagar.com

প্রাণীকুলের মাঝে মোলাস্কু বলে একটা গোত্রে ফেলা হয় অক্টোপাসকে, সেফালোপড় বলে ডাকা হয় এদের। সেফালোপড কথাটার অর্থ 'মস্তকপদী'। মানে মাথা থেকেই যাদের পা শুরু হয়েছে। কথাটা সত্যি, থলির মতো একটা মাথা রয়েছে অক্টোপাসের, ওটাই তার শরীর। এখান থেকেই শুরু হয় এর আটটি পা, শুঁড়ের মতো কিলবিল করে চারপাশে। আরও অনেক রকমের সেফালোপড রয়েছে সাগরের পানিতে। স্কুইড, ক্যাটফিশ, নটিলাস, এই প্রাণীগুলোর একেকটার সাথে দশটা কি তারও বেশি করে শুঁড় রয়েছে।

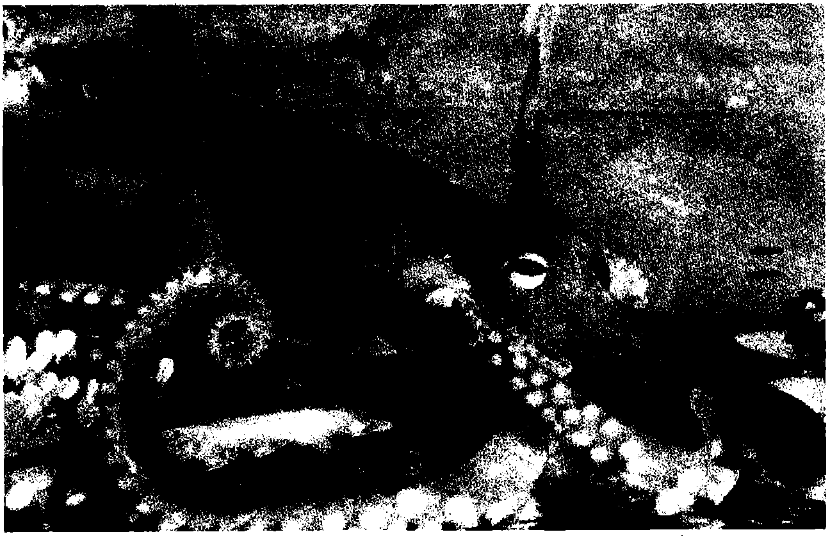

ডুবুরিদের জন্য একসময় ভয়ের কারণ বলে গণ্য হলেও দিন দিন যতো উন্নত হচ্ছে স্কুবা ডাইভিং স্যুট, ভয়টা ততোই কেটে যাচ্ছে মানুষের মন থেকে। গভীর সাগরতল থেকে এদের ছবি তুলে আনছেন ফটোগ্রাফাররা, বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন সব তথ্য।

অনেক জাতের অক্টোপাস রয়েছে সাগরে। সবচেয়ে বড়োগুলোকে বলে 'জায়ান্ট অক্টোপাস'। পুরুষগুলোর ওজন পঞ্চাশ পাউণ্ড হয়, মাদীগুলো হয় তেত্রিশ পাউণ্ড-এর কাছাকাছি। আকারে হয় প্রায় আট ফুটের মতো লম্বা। ১৯৫৭ সালে কানাডার কাছে অতিকায় এক জায়ান্ট পাওয়া গিয়েছিল, একত্রিশ ফুট ছিল সেটা লম্বায়, ওজন ছিল ছ'শো পাউণ্ড। ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে আলাস্কা পর্যন্ত সাগরে পাওয়া যায় 'প্যাসিফিক জায়ান্ট অক্টোপাস', পুর্ব দিকে জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত এদের আবাস।

www.pathagar.com

স্বভাব চরিত্রের কথা উঠলে বলতে হয়, স্বাভাবিক প্রাণীসুলভ সবরকমের বৈশিষ্ট্যই রয়েছে এদের মাঝে। নিজের জন্য একটা জায়গা আলাদা দখল করে রাখে অক্টোপাস, দখল বজায় রাখতে প্রয়োজনে বেপরোয়াও হয়ে উঠতে পারে সময় সময়। এছাড়াও ভয় কৌতূহল সবই আছে এদের। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সাধারণ পোষা বেড়ালের মাথায় যতটুকু বুদ্ধি, এদের মাথাতেও আছে ততোটাই।

অক্টোপাসের শিকার ধরা

অক্টোপাসের শিকার ধরার কৌশল বড় বিচিত্র। শিকার ধরার সময় হলে এক জায়গায় বসে পড়ে অক্টোপাস। কুঁতকুঁতে চোখদুটো মেলে চারপাশে খোঁজ করে খাবারের। গা ঝাড়া দিয়ে সচল হয় একসময়, থলির মত ম্যান্টেলের একপাশ থেকে টেনে নেয় পানি, সাইফনের মত বেরিয়ে আসতে থাকে অন্যপাশ থেকে। এর ফলে এরা তীরবেগে ধেয়ে যেতে পারে

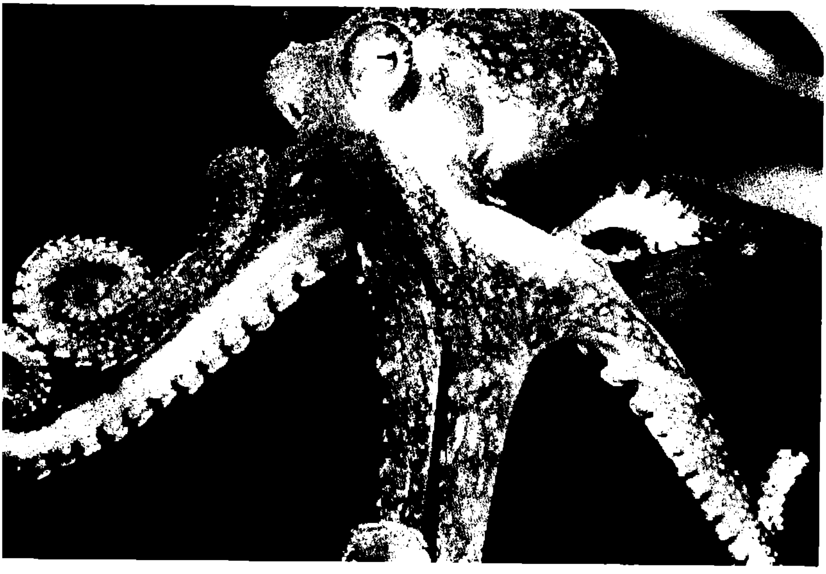

সাগরতলে মাটির সামান্য ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে শুঁড়গুলো খাবারের সন্ধানে ছুঁয়ে দেখে মাটি। পাওয়া গেলে আর কথাই নেই, হতভাগ্য শিকারের ওপর ছাতার মত ঝুপ করে নেমে আসে আটটা পা। সেই মরণ আলিঙ্গন থেকে রক্ষা পাবার সাধ্য হয় না কারও।

www.pathagar.com

অক্টোপাসের খাওয়ার ধরন

শুধু মরা সামুদ্রিক জীবই নয়, জীবন্ত অনেক কিছুই রয়েছে এদের খাবারের তালিকায়; যেমন, কাঁকড়া। শিকারে বেরুলে শুঁড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে চামড়ার ভাঁজে একবারে ডজনখানেকের মত জীবন্ত কাঁকড়াকে ধরে নিয়ে আসতে পারে অক্টোপাস। এমনও দেখা গেছে কাঁকড়ার সন্ধানে সাগরতীরে পানি ছেড়ে বালুচড়ায় উঠে এসেছে এরা। অ্যাবালোন বলে এক ধরনের সামুদ্রিক জীব আছে। এই প্রাণীগুলো অক্টোপাস এর দূর সম্পর্কের আত্মীয় হলেও খাবারের তালিকা থেকে তারাও বাদ যায় না। খিদে পেলে

জাতভাই-টাতভাই মানে না অক্টোপাস, স্বজাতি ধরে খেয়ে ফেলতে পারে অনেক সময়। অনেকক্ষণ ধরে না খেয়ে থাকতে থাকতে শেষে নিজের শুঁড় নিজেই খেয়ে ফেলেছে অক্টোপাস– এমন নজিরও রয়েছে। টিকটিকির লেজের মত এদের শুঁড়গুলো। তার মানে এগুলো কাটা পড়লে আবার পরে গজায়। তিমি, ডলফিন, সীল কিংবা সী-লায়নের মত অনেক সামুদ্রিক জীবের কাছে খাদ্য হিসেবে বেশ পছন্দ অক্টোপাসের এই শুঁড়। কামড় দিয়ে কোনো প্রাণী হয়তো আলাদা করে ফেলে একটা শুঁড়কে। শিকারী ওটাকে আলাদা চিবুতে চিবুতেই বাকি সাতটাসহ প্রাণ নিয়ে পালায় অক্টোপাস।

www.pathagar.com

অক্টোপাসের জন্মবৃত্তান্ত

শীতকালে শুরু হয় এদের প্রজনন ঋতু। স্ত্রী অক্টোপাস একসাথে প্রায় আশি হাজারের মত ডিম পাড়ে। আকারে একেকটা চালের দানার চেয়ে বড় হবে না ওগুলো, দেড়শো থেকে দু'শোটা করে থাকে একেকটা গুচ্ছে। দেহ নিঃসৃত আঠালো তরল দিয়ে আস্তানার ছাদের সাথে ডিমের গুচ্ছ আটকে দেয় মা, সারাক্ষণ নজর রাখে সেগুলোর ওপর। ডিম ফুটে বেরোবার পরপরই

ওপরের দিকে রওনা দেয় শিশু, সামুদ্রিক শৈবাল খেয়ে বাঁচিয়ে রাখে অস্তিত্ব। বেশিরভাগের কপালেই অবশ্য অস্তিত্ব রক্ষা আর হয়ে ওঠে না, মাঝ রাস্তাতেই পরিণত হয় কাঁকড়া আর ছোট ছোট মাছের উপাদেয় খাবারে। একেকটা ডিমের গুচ্ছ থেকে খুব বেশি হলে দুটো থেকে পাঁচটি মাত্র অক্টোপাস টিকে থাকতে পারে পরিণত বয়স অবধি। এমনিতে এরা বাঁচে চার বছর। ডিম ফুটে যতক্ষণ না শিশু অক্টোপাস বের হয় ততক্ষণ জায়গা ছেড়ে নড়ে না মা অক্টোপাস। থলি থেকে বেরোনো পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখে ওগুলোকে। শুঁড় নেড়ে নেড়ে আশেপাশে ঘেঁষতে দেয় না কোন প্রাণী বা মাছকে। ছ'মাস কি তারও বেশি সময় হয়তো লাগে ডিম ফুটতে। পুরোটা সময় এভাবে পাহারা দেয় সে, খেতে পর্যন্ত ভুলে যায়। বেশিরভাগ সময়েই এ কারণে না খেয়ে মারা পড়ে মা। তখন ডিমগুলো পরিণত হয় অন্যদের সহজ খাবারে।

www.pathagar.com

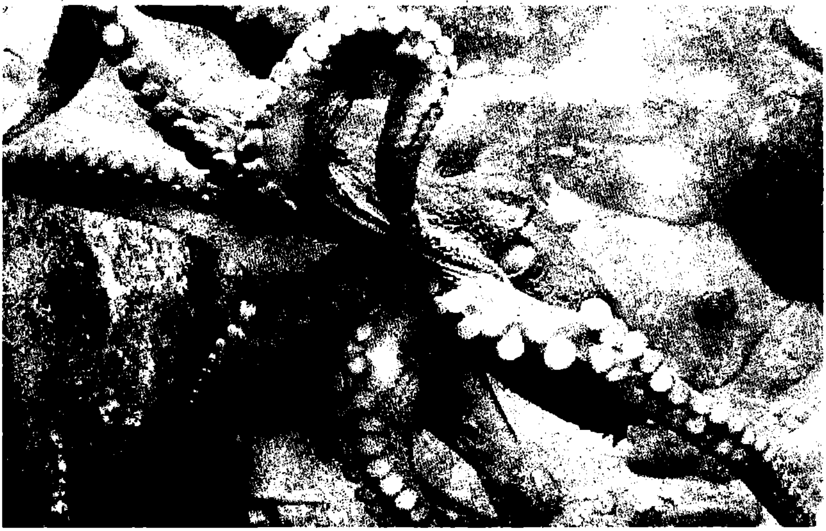

অক্টোপাসের বৈশিষ্ট্য

অক্টোপাস যেচে পড়ে কারও সাথে লাগতে যায় না, এটা সবারই জানা। শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্যে চারপাশে কালো এক ধরনের তরল ছিটিয়ে দেয় এরা। আগে সেটাকে নেহাতেই একটা ধোঁয়াটে পর্দা বলে মনে করা হত। ইদানিং নতুন নতুন সব তথ্য বেরিয়েছে। থলি থেকে বেরোবার পর

www.pathagar.com

নাকি অক্টোপাসের মতই অবয়ব নেয় কালিটা। পানির ভেতর ঝুলে থাকে এক জায়গায়। শিকারী ভাবে, ওটাই বোধ হয় তার শিকার, আসল শিকার ততক্ষণে পালায় অন্যদিকে।

গায়ে কঙ্কাল বলতে কিছু নেই অক্টোপাসের। সুবিধেই হয়েছে এর ফলে। জালে আটকে পড়লে খোঁজ করে ফাঁক ফোকরের, কোনমতে একটা শুঁড় বের

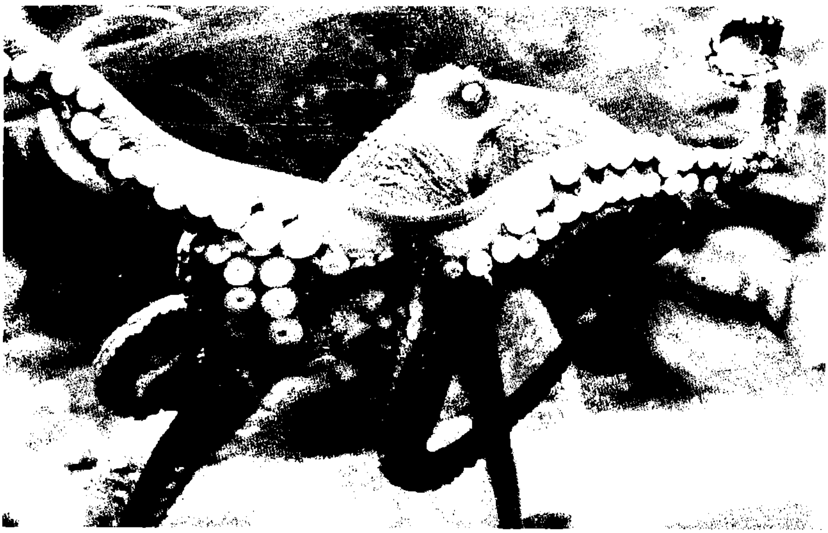

করে দিতে পারলেই হলো। চেপে চেপে গোটা শরীরটাই এরপর বের করে আনে এক সময়। এই কারণে অক্টোপাসকে যেমন তেমন জালে আটকানো সহজ নয়।

এদের আরও একটা বৈশিষ্ট্য হলো রঙ বদলানো। গায়ের রঙ সাধারণত গাঢ় লাল হয় জায়ান্ট অক্টোপাসের। বিপদ টের পেলে নিমেষে পাল্টে ফেলে সে রঙ।

চারপাশের রঙের সাথে মিশে গিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। আত্মরক্ষা ছাড়াও শিকার ধরতে সাহায্য করে তার এই ক্ষমতা। চোখের পলকে সাদা করে ফেলতে পারে এরা শরীর।

তখন ওপর থেকে সূর্যের আলো পড়লে ভালমত বোঝা যায় না কোথায় রয়েছে অক্টোপাস। সমুদ্র তলদেশে পৌঁছাবার সাথে সাথে আবার ফিরে পায় গাঢ় লালচে রঙ। বোকা বনে যায় শিকার, ফলে অনায়াসেই তখন অক্টোপাসের খাবার হয়ে যায় সে।

www.pathagar.com

পানির রাজা তিমি

তিমি সিটাসিয়া বর্গভুক্ত জলজ স্তন্যপায়ী। তিমিকে প্রায়ই তিমি মাছ বলা হয়। তবে এরা কিন্তু মোটেও মাছ নয়, বরং মানুষের মতই স্তন্যপায়ী। তিমির বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী নীল তিমি, খুনে তিমি (killer whale), এবং পাইলট তিমি, যার নামের সাথে তিমি আছে বটে কিন্তু জীববৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনে তাদের ডলফিন হিসেবে গণ্য করা হয়।

* বাচ্চা তিমি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১০ পাউন্ড করে বাড়ে।

* কিলার হোয়েলের প্রতি মিনিটে হৃদস্পন্দনের হার পানির নিচে ৩০ বার আর পানির ওপর ৬০ বার।

তিমি মাছ নয়

তিমিকে আমরা মাছ বলি, সেই তিমি কিন্তু মাছ নয়। এদের রক্ত গরম আর মানুষের মতোই এদের বাচ্চা হয়। বিভিন্ন জাতের তিমির বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য। কোন কোন তিমির ওজন হয় ১০০ টনেরও বেশী, আবার কেউ কেউ হয় লম্বায় ১০০ ফুট। কোন কোন তিমির মুখে দাঁত থাকে, আবার কারও কারও মুখে থাকে লুচি ভাজা ছান্তার মতো হাড়। এরা একসঙ্গে

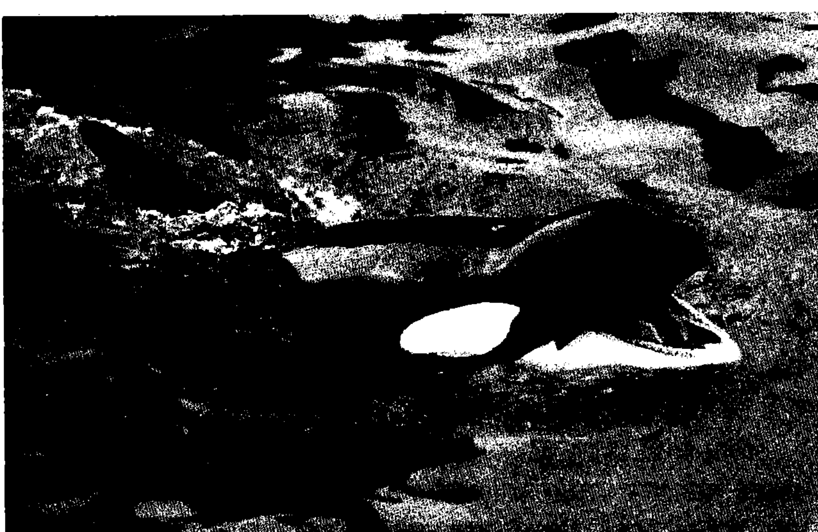

www.pathagar.com

অনেকখানি পানি মুখে টেনে নিয়ে পানিটা যখন বের করে দেয় তখন ওই হাড়ের জালিতে ছোটখাটো মাছ ইত্যাদি আটকে যায়। এরা যেহেতু মাছ নয় তাই, ২০-২৫ মিনিটের বেশি পানিতে ডুবে থাকতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়

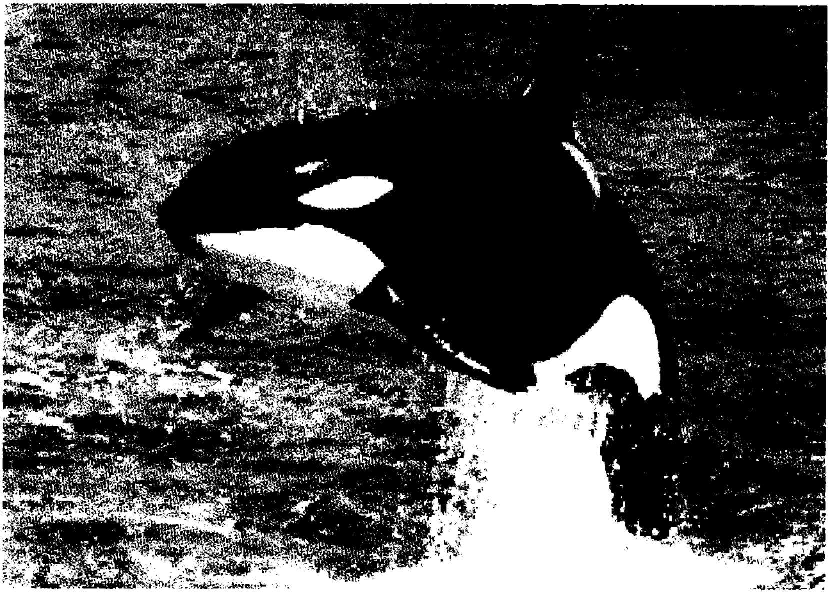

অন্তর প্রশ্বাস নেওয়া এবং নিশ্বাস ছাড়ার জন্য ওপরে উঠে আসে। এরা দম ছাড়লে ফোয়ারার মত পানি ওঠে।

নার-হোয়াল নামে ছোট একজাতের তিমি আছে, এদের আবার শুঁড় থাকে।

সমুদ্রের সবচেয়ে বড় বাসিন্দা হলেও তিমিকে মাছ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। কারণ, তিমি হলো স্তন্যপায়ী জন্তু।

আমাদের এই অতি পরিচিত প্রাণীটার নাম যে তিমি তা নিশ্চয়ই আর আলাদা করে বলে দিতে হতে হবে না। শুধু পানিরই নয় তিমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী। তবে সব থেকে বড় হয় Blue হোয়েল বা নীল তিমি।

এদের এক একটার আকার আদিম কালের বিরাটকার সরীসৃপদের অনেকের থেকেই অনেক বেশী। সত্তর আশি ফুটের নীল তিমি হামেসাই দেখা যায়। অনেক সময় এদের আকার একশ ফুটের কাছাকাছিও চলে যায়।

www.pathagar.com

নীল তিমি

বিশ্বের সেরা প্রাণীদের তালিকায় একেবারে শীর্ষে রয়েছে নীল তিমি বা Blue Whale-এর নাম। ওজন এবং আকৃতিতে এই প্রাণীটি এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত এবং জীবিত প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। সামুদ্রিক প্রাণী বা লোনা পানিতে অবস্থানরত এই তিমি পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে এর ওজন ১৯০ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। এবং লম্বার মাপ ৩০ মিটার। কখনও কখনও এই মাপ আরও বেশি হয়ে থাকে।

তিমির জাত ও বৈশিষ্ট্য

প্রাণীবিজ্ঞানের ভাষায় তিমিরা ক্যাটেসিয়া বর্গ ভুক্ত প্রাণী। প্রায় ১০০ টা প্রজাতির তিমি মাছ দেখতে পাওয়া যায়। তবে আমরা মোটামুটি ভাবে এদের দুই ভাগ করতে পারি- দাঁতল এবং দন্তহীন। সাধারণত দন্তহীন তিমিরাই আকারে অতিকায় হয়ে থাকে। তা হলে কি হবে এদের খাদ্য নালী এত সরু যে এদের ছোট ছোট মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীব খেয়েই থাকতে হয়। এই সব তিমিদের মুখে একরকম চিরুনির মতো হাড়ের ঝালর থাকে, একে হোয়েল বেল বলা হয়। খাবার সময় ওরা বিরাট হা করে যতটা পারে সমুদ্রের পানি টেনে নেয়।

www.pathagar.com

তার সাথে নানা রকম পানির প্রাণী ছোট ছোট মাছ ও আগাছা ওদের মুখে ঢুকে যায়। তখন মুখ বন্ধ করে পানিটা হোয়েল কোণের ভিতর দিয়ে ছেড়ে দেয়। ফলে পানিটা বেরিয়ে গেলেও ছাকনির মতো হোয়েল কোনে যে সব মাছ সামুদ্রিক প্রাণী মুখে ঢুকেছিল তারা আটকে যায়। তখন তাদের এরা আস্তে আস্তে গিলে ফেলে।

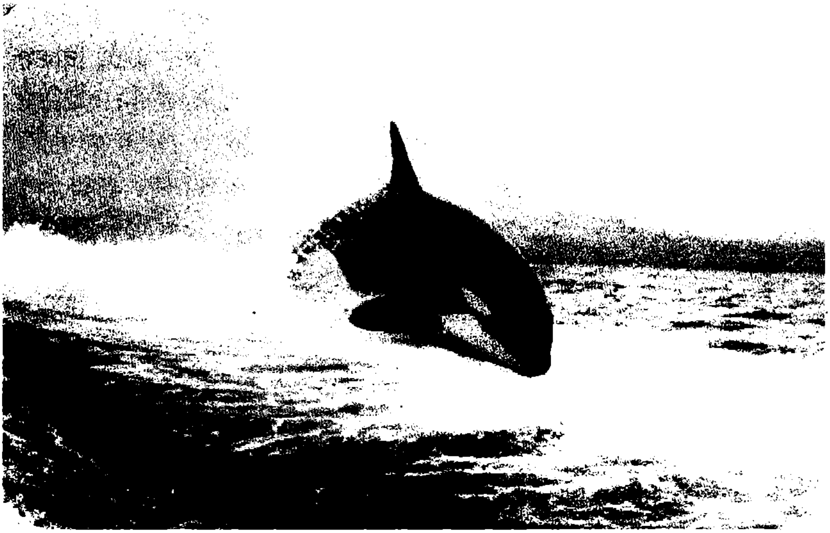

উত্তর আটলান্টিকের সাদা তিমিও এই বড় জাতের তিমিদের মধ্যে পড়ে। অতিকায় তিমিরা অনেকটাই নিরীহ প্রাণী। দাঁতাল তিমিরা তুলনায় কিছুটা ছোট হলেও এরা মোটের উপর বেশ হিংস্র হয়ে থাকে। স্পার্ম তিমি এই রকমই একটা দাঁতাল তিমি। এদের মাথাটা থ্যাবড়া মতো ও বেশ বড়। সেই মাথায় মোমের মতো একটা পদার্থ ভর্তি একটা বিরাট থলি থাকে। সেই জন্য এদের মোম তিমিও বলা হয়। এই মোম বা চর্বি জাতীয় পদার্থ গভীর পানির তলার চাপ থেকে শরীরের নরম অংশ রক্ষার কাজে লাগে। এই তিমিদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে অক্টোপাস। এরা আকারে অনেক সময়ই ৬০ ফুটের কাছাকাছি হয়।

বাংলাদেশের তিমি

বাংলাদেশের সুন্দরবনের মালঞ্চ নদীর মোহনার ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ থেকে শুরু হয়েছে অতলস্পর্শ 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' এলাকা। ঐ এলাকায় বঙ্গোপসাগরের মহীঢাল ১০০ মিটার। কিন্তু পাশের অতলস্পর্শ ৫০০ মিটার

www.pathagar.com

গভীর, আরও দক্ষিণে ৮০০ মিটার গভীর। এ ধরনের অতলস্পর্শকে 'সাবমেরিন হোল' বা সাবমেরিন ক্যানিয়ন বলা হয়। এখানে পলি জমতে পারে না। এই অতলস্পর্শ চলে গেছে শ্রীলঙ্কার কাছাকাছি। এই এলাকাগুলোতে প্রচুর Plankton, জেলিফিশ, ছোট চিংড়িজাতীয় প্রাণী, স্কুইড ও ক্যাটল ফিশ বাস করে। এদের খেতে এই এলাকায় জড়ো হয় ডলফিন ও তিমি।

অতলস্পর্শে যে তিমি প্রজাতিটি নিয়মিত দেখা যায়, সেটি হচ্ছে ব্রিডিস হোয়েল (Balaenoptera edeni)। এটি মাঝারি আকারের তিমি। ব্রিডিস বেলিন জাতের তিমি। এদের দেহের উপরি ভাগ বাদামি থেকে সাদাটে, নাকের ছিদ্র দুটি। এই ছিদ্র দিয়ে এরা ভেসে ওঠার পর ঝরনার মতো জল ছড়ায়। ২০-২৫ মিনিট পর পর ভেসে ওঠে।

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় আরেকটি তিমির উপস্থিতি সম্পর্কে গুঞ্জন আছে। কটকা অভয়ারণ্যের সমুদ্রসৈকতে একটি স্পার্ম তিমির (এই তিমির আকৃতি অনেকটা শুক্রাণুর মতো) মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল একবার। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত নন, এটি আমাদের এলাকার, নাকি দূর সমুদ্র থেকে

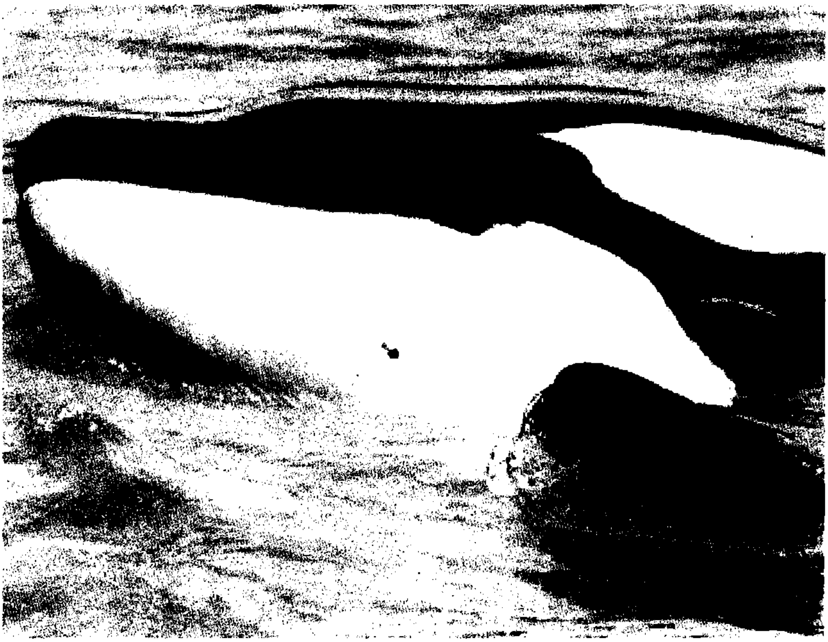

www.pathagar.com

ভেসে এসেছে। অতলস্পর্শ এলাকায় দেখা মেলা তিন প্রজাতির ডলফিনের একটি হলো বটল্-নোজ ডলফিন (Tursiops truncatus)। আকারে মোটামুটি বড়সড়, ঠোঁট লম্বাটে, অনেকটা বোতলের অগ্রভাগের মতো, চোখ স্পষ্ট, পিঠের পাখা বেশ বড়, দেহের বর্ণ উপরিভাগ হালকা বাদামি, তলার দিকটা হালকা হলদেটে। এরা খুব আমুদে প্রাণী। ৩০-৪০টি প্রাণী মিলে মাছের ঝাঁকে আক্রমণ চালায়। অনেক লাফঝাঁপ করে, শূন্যে ডিগবাজি খায়।

বটল-নোজ ডলফিন ও স্পিনার ডলফিন (Stenella longirostris) জাহাজ বা জেলে-নৌকার কাছাকাছি থেকে সাঁতরাতে ভালোবাসে। একে

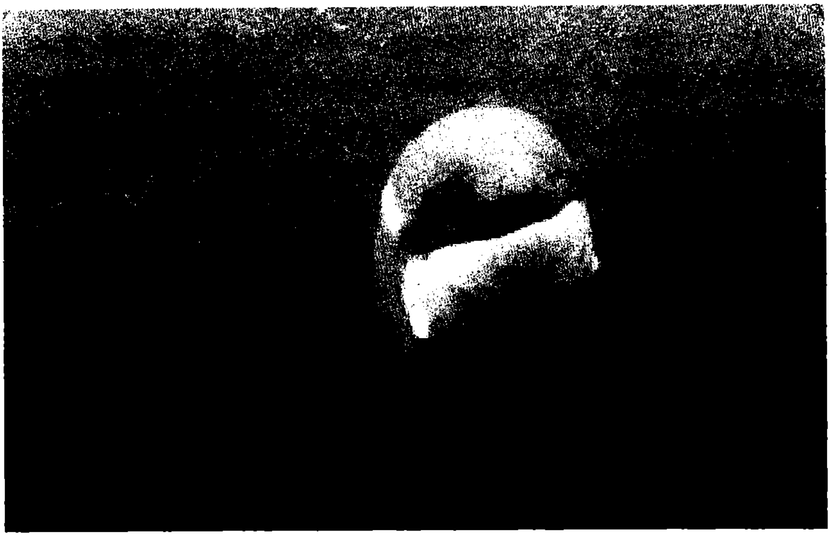

বলে 'বো রাইডিং'। পৃথিবীর যেসব অ্যাকুরিয়ামে ডলফিন শো হয়, সেখানে বটল-নোজ ও স্পিনার ডলফিনের ব্যাপক কদর। আরেক প্রজাতির ডলফিন বঙ্গোপসাগরে দেখা যায়। এই প্রজাতির নাম স্পটেড ডলফিন। ঠোঁট লম্বাটে, পিঠের পাখার তলার দিকটা ছড়ানো, শীর্ষ দেশ সুচালো। এরাও দলেবলে শিকার করে।

তিমির ফোয়ারা

তিমি এক ধরনের স্তন্যপায়ী জন্তু। সাধারণত যেসব জীব শিশু অবস্থায় মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয় তাদেরই স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে। পানিতে থাকে বলে তিমিরের চেহারাটা অনেকটা মাছের মতো। কিন্তু মাছ যেরকম ফুলকার সাহায্যে

www.pathagar.com

শ্বাসকার্য চালায়, তিমি সেরকম নয়। তিমির শরীরে আমাদের মতোই ফুসফুস রয়েছে। পানিতে বাস করলেও তিমি কিন্তু মাছের মতো বেশিক্ষণ পানির তলায় ডুবে থাকতে পারে না। ফুস্‌ফুস দিয়ে শ্বাস নেওয়ার জন্যে কিছুক্ষণ পরপরই তাকে পানির ওপরে ভেসে উঠতে দেখা যায়। আর সেই সময়েই পানির ওপর মুখ রেখে সে ফোয়ারা তোলে। কিন্তু তিমি পানির ফোয়ারা তোলে কেন?

যেসব প্রাণী ফুসফুস দিয়ে শ্বাসকার্য চালায় তারা কিন্তু বাতাস থেকেই অক্সিজেন নেয়। বাতাস দিয়ে তারা ফুসফুস ভর্তি করে ফেলে। ফুসফুসে বাতাস ভর্তি করতে হয় বলেই তিমি মাঝে মাঝে পানির ওপরে ভেসে ওঠে। কখনো কখনো পানির ওপরে সে শুধু নাকটাকে তুলে রাখে। তিমির মুখের পেছনটায়, মাথার সামনে একটা উঁচুমতো জায়গা আছে। এই উঁচু জায়গার ওপরেই রয়েছ তার নাকের ছিদ্র। তাই পানিতে ভাসবার সময়ে সমস্ত শরীরটা পানির তলায় রাখলেও তিমি নাকের ফুটোটাকে পানির উপরে তুলে রাখতে পারে। এই অবস্থায় সে বাতাসের অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। এই সময় মাঝে মাঝেই সে নাকের ফুটো দিয়ে ফোয়ারার মতো করে অনেক উঁচুতে পানি ছিটোতে থাকে। তিমির এই ধরনের পানি ছেটানো দেখে অনেকেই ভেবে নেন যে, মুখ দিয়ে তিমি যে পানিটা নেয় তাইই ফোয়ারার মতো করে নাকের ফুটো দিয়ে বের করে দেয়।

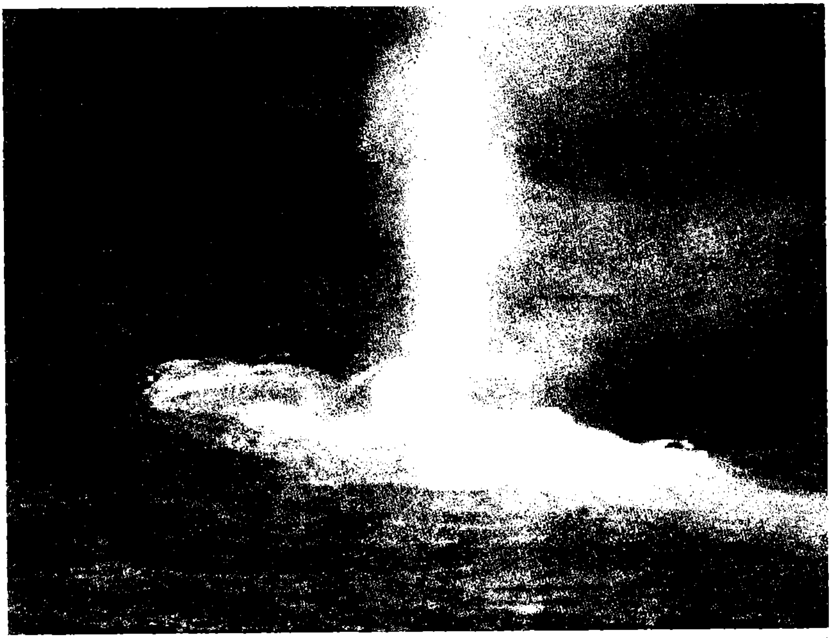

www.pathagar.com

তবে নাকের ফুটো দিয়ে ফোয়ারার মতো পানি বেরিয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু তা মুখ দিয়ে নেওয়া পানি নয়।

তিমির শরীরটা যেমন বিরাট, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তেমনি বড়। তিমির ফুসফুসও অনেক বড় হয়। সমুদ্রের তলায় অনেকক্ষণ থাকতে হয় বলে তিমি একেবারে অনেকটা বাতাস নিয়ে ফুসফুস দুটোকে ভর্তি করে নেয় এবং ফুসফুসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়। ফুসফুসের বাতাসে অক্সিজেন

ফুরিয়ে গেলে আবার নতুন করে বাতাস নেবার জন্যে পানির ওপরে ভেসে ওঠে। ফুসফুসের ভেতরে যে বাতাস রয়েছে তা বের না করে দিলে তো আর নতুন বাতাস নিতে পারবে না। তাই প্রথমেই ফুসফুস থেকে তিমি বাতাস বের করে দেয়। নিঃশ্বাসের সময় এত বড় ফুসফুস থেকে হাওয়া খুব জোরে বেরোতে থাকে। ফুসফুস থেকে যে বাতাস বের হয়ে তাতে জলীয়বাষ্প এবং শে□ষ্মাও পাওয়া যায়। ফুসফুসের বাতাস বেশ গরম থাকে। গরম বাতাস বেরোনোর মুখে সমুদ্রের ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে এসে বাতাসের জলীয়বাষ্প পানিতে পরিণত হয়। এই পানিই ফুসফুসের চাপে ফোয়ারা হয়ে ওপর দিকে উঠতে থাকে।

জলদানব টাইগারফিশ

তোমরা তো জানোই কুমির কি খায়। মাছ তো খায়ই আবার সুযোগ পেলে যেকোন প্রাণীও ধরে খেয়ে ফেলে। আচ্ছা তবে এখন বলো তো

www.pathagar.com

কুমিরকে কে খেতে পারে? বিশ্বাস হচ্ছে না! কুমিরও কিন্তু কারো কারো খাদ্য। তবে শোন, আজ সেই বিচিত্র ঘটনা!

এক ধরনের মাছ আছে যেগুলো সামনে আসলে কুমিররা খাওয়া দাওয়া ভুলে জান বাঁচাতে পড়িমরি করে দৌড় লাগায়। কারণ এই মাছগুলো খুবই ভয়ানক। ধরে ধরে কুমির খেয়ে ফেলে। এমনকি সুযোগ পেলে মানুষকেও

www.pathagar.com

ছাড়ে না। এই মাছের নাম দৈত্যাকার টাইগার ফিশ। মূলত সাগরের গভীরে এই মাছের জন্ম হলেও মাঝে মাঝেই সাগরের সাথে যেসব নদী সরাসরি মিলিত হয়ে থাকে– সেসব গভীর নদীতে ভেসে আসে। ঠিক যেমনটি ঘটেছে ছবিতে দেখানো মাছ শিকারী জেরেমি ওয়েডের বেলায়।

জেরেমি ওয়েড নামের এই বেচারা শখের মাছশিকারি। আফ্রিকার কঙ্গো নদীতে সাহস করে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন মাছ শিকারি আর সেখানেই ঘটে

www.pathagar.com

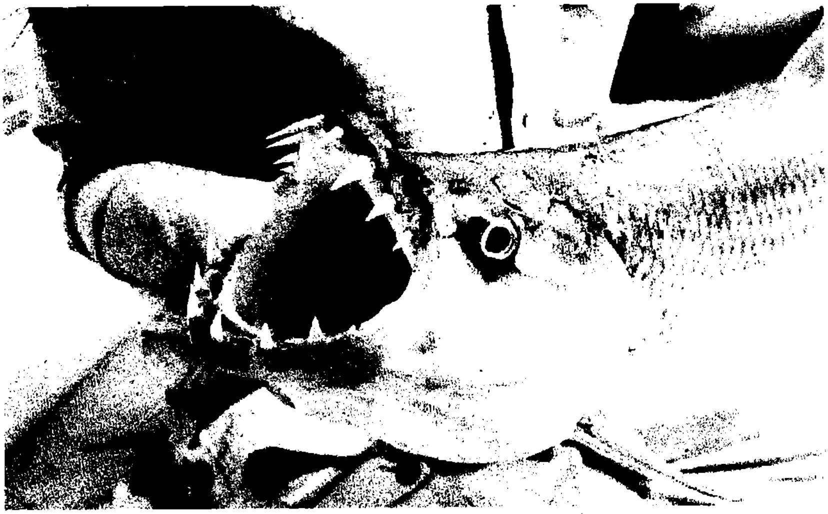

এই ঘটনা। টানা বড়শীতে গেঁথে ফেলেন ইয়া বড় এক টাইগার ফিশ। সমুদ্রের পানির উজান ধরে স্রোতের বিপরীতের চলতে অভ্যস্ত এই টাইগার ফিশ আফ্রিকার কঙ্গো নদীতে চলে আসে মাঝে মাঝে। টাইগার মানে তো বাঘ। আর বাঘের আচরণ তো তোমরা জানোই। এই মাছগুলো ঠিক তেমনি পানির বাঘ। এই টাইগারফিশ কিন্তু অনেকটাই আবার হাঙরের মতোই। সাধারণ মাছের আকারের দিক থেকে এই টাইগার ফিশগুলো কিন্তু অন্যান্য মাছের চেয়ে অনেক বড়।

www.pathagar.com

টাইগার ফিশের আছে ৩২ টি ধারালো দাঁত। যে টাইগারফিশটিকে ধরা হয়েছিলো সেটি বেশ কষ্ট করেই ধরতে হয়েছে। এতো সহজে কি আর তাকে কাবু করা যায়! এই মাছ এতোই ক্ষিপ্র আর দ্রুতগতির যে একে ধরা খুব কঠিন। কাউকে যদি একবার টার্গেট করে তবে তাকে অতি দ্রুত কাবু করে ফেলার ক্ষমতা রাখে এই মাছ। কঙ্গো নদীর যে অংশে এরা বাস করে সেখানে যাওয়াটাও খুব সহজ নয়।

এই মাছের নাম দৈত্যাকৃতির টাইগারফিশ হলো কেন ভাবছো? এটা তো বেশ সোজাই জবাব। এরা তো পানির দানবই। বাঘের মতো এর আচরণ, দেহ আর দাঁত। সব মিলিয়েই এই রাজকীয় নাম দেয়া হয়েছে। দাঁতগুলো রেজরের মতোই ধারালো আর উপর নিচে সমানভাবে সাজানো থাকে। একবার হা করলে তো সর্বনাশ! আস্ত একটা কুমির যেন মুখের ভিতরেই সেঁধিয়ে যাবে সহজে। বাঘ তাও অনেকটা ভদ্রই বলতে হবে এদের তুলনায়। কারণ এই টাইগার ফিশগুলো যেন একেকটা বুনো পাগলাটে স্বভাবের। পানিতে কিছু নড়াচড়া দেখলেই ব্যস! দ্রুতগতিতে এসেই ধারালো দাঁত বসিয়ে দেবে। এই মাছগুলো যেখানে থাকে সেখানে কুমির তো যায়ই না, আশেপাশেও আসে না জানের ভয়ে।

www.pathagar.com

এই মাছগুলো ছোটো অবস্থায় পিরানহার মতোই দল বেঁধে থাকে। মা মাছেরা বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর কামড় দিয়ে শিকার করতে শেখায়। আর বড়ো হলে তো একেকটা রাক্ষুসে দানবে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেও তাদের এতটুকু বাধে না। তবে অনেক সময় একসঙ্গে চার পাঁচটা টাইগার ফিশ একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায় শিকারের খোঁজে। শিকার মিললে শুরু হয় খাবার প্রতিযোগিতা। তবে এরা খাবার সময় কাউকে ভাগ দিতে নারাজ। পারলে একবারে নিজেই সব খেয়ে ফেলে। আর এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে একে অন্যের লেজও খেয়ে ফেলতে পারে।

টাইগারফিশগুলোর কেউ কেউ পুরোপুরি ধূসর রঙের হয় আর দেহের পাশ বরাবর একটি দু'টি কালো রেখা থাকতে পারে। আবার কারো কারো সাদা, বাদামী বা ধূসর রঙের ওপর মোটা কালো দাগও থাকতে পারে। লম্বায় ৬ থেকে ৭ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে এরা। আর ওজনের কথা যদি বলো, তাও নেহাত কম নয়। ৫০ কেজিরও বেশি হতে পারে একেকটার ওজন।

এদের শিকার ধরার ভঙ্গিটিও বিচিত্র। বাঘ যেভাবে ঘাপটি মেরে বসে থেকে দ্রুতগতিতে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার ধরে, এই মাছগুলোও শিকার ধরার বেলায় এমনটি করে। এদের শরীরে গ্যাস ভরা

www.pathagar.com

একধরনের থলি থাকে। আর এই থলির সাহায্যে কোথাও শব্দ হলে সাথে সাথে সেটি ধরে ফেলতে সক্ষম এই দানবেরা।

তরুণ টাইগারফিশ যেকোন আকারের শিকারই ধরে সাবাড় করে দিতে পারে। কিন্তু বাচ্চাগুলো অতোটা পারে না। তারা শুধু কাছে পেলে তবেই হামলা করে, তাও নিজে নিরাপদ দুরত্বে থেকে।

এই রাক্ষুসে মাছ পানির রাজা শার্ক বা হাঙরকেও ছেড়ে কথা বলে না। এই কারণে রাজা তার অন্যান্য প্রজার সাথে যে আচরণ করে শুধু এই টাইগার ফিশের বেলায় থাকে ঢিলেঢালা। কারণ, এক টাইগার ফিশকে আক্রমণ করলে ক্ষণিকের মধ্যেই জুটে যায় অসংখ্য সঙ্গী সাথী। সুতরাং তখন হাঙরের পালিয়ে যাবারও উপায় থাকে না।

সমুদ্রের পানি বেয়ে নদীতে আসার পর টাইগার ফিসের খাবারের আওতা বেড়ে যায় স্থলভাগের দিকেও। কারণ, তারা যে শুধু পানিতে শিকার করে তা নয় কিন্তু। সুযোগ পেলে ডাঙার প্রাণীও শিকার করে ফেলে। তবে সত্যিকারের বাঘের মতো তো আর জঙ্গলে এসে শিকার করতে পারে না। কেবল যেসব প্রাণী নদীর কিনারে যায় তাদের জন্যই বিপদ। আর এজন্যই কুমিরের জন্য বিপদ। কারণ কুমির তো নদীর কিনারেই থাকে। আমাদের

www.pathagar.com

কিন্তু ভয় নেই। বাংলাদেশে তারা দয়া করে ঘুরতে আসবে না বলেই মনে হয়। তবে একটা কথা, কেউ যদি কোন আফ্রিকান নদীর ধারে কাছে যাও তবে একটু সাবধানেই থেকো।

পানির প্রাণী সীল

তিমির মতোই পানির প্রাণী কিন্তু মাছ নয়– এ রকম আরো কয়েকটা প্রাণী রয়েছে। যেমন সীল। এরাও স্তন্যপায়ী এবং অনেককাল আগে ডাঙ্গার বাসিন্দা ছিল। বড় বড় প্রজাতির সীল লম্বায় পাঁচশ-তিরিশ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। তবে এদের বেশীর ভাগ প্রজাতিই চোট হয়। এরা সাধারণত পানিতে

থাকলে ডাঙ্গাতেও থাকে। তিমির মতো পুরোপুরি পানির বাসিন্দা নয়। সীল পাওয়া যায় সমুদ্রের একেবারে উত্তরাঞ্চলে আর দক্ষিণে। অর্থাৎ এরা শীতল অঞ্চলের বাসিন্দা। পানিতে সাঁতারের সুবিধার জন্য এদের পেছনের দুপা দুরে গিয়ে লেজের মতো হয়েছে। আবার সামনের দুপা দিয়ে পেছন দিকটা ঘসটে ঘসটে এরা ডাঙ্গার উপর হাঁটাচলা করে।

www.pathagar.com

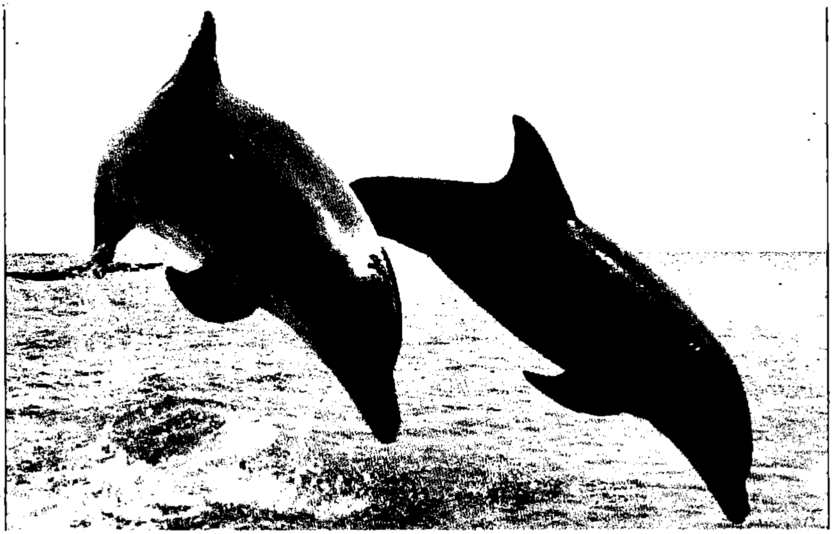

সমুদ্রের বিস্ময় ডলফিন

ডলফিন এক ধরনের সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। পৃথিবীতে ১৭টি গণে প্রায় ৪০ প্রজাতির ডলফিন রয়েছে। ১.২ মিটার (৪ ফুট) দৈর্ঘ্য এবং ৪০ কেজি (৯০ পাউন্ড) ওজন থেকে শুরু করে ৯.৫ মিটার (৩০ ফুট) দৈর্ঘ্য এবং ১০ টন ওজন পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের ডলফিন দেখা যায়। ধারণা করা হয় দশ মিলিয়ন বছর আগে মায়োসিন যুগে ডলফিনের উদ্ভব। ডলফিনকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রানিদের কাতারে ধরা হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরন এবং খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা মানবসমাজের কাছে ডলফিনকে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছে। মাংসাশী প্রানী, মাছ এবং স্কুইড এদের প্রধান খাদ্য।

ডলফিনের বুদ্ধিমত্তা

পানি থেকে এই শুন্যে উঠে আসে তারপর ভেসে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর ঝপ করে আবার পানিতে পড়ে যায়। কারা এই কাজ করে বলতো? তাদের নাম ডলফিন। তারা এই ধরনের কাজ করে কোথায়? সমুদ্রে , নয়তো চিড়িয়াখানায়।

বিজ্ঞানীরা চিড়িয়াখানার এ্যাকুরিয়ামে বাস করা ডলফিন নিয়ে গবেষনা করে দেখেছেন। ডলফিনরা তাদের বুদ্ধির জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। তাদেরকে প্রায় সকল ধরনের খেলার কৌশল শেখানো যায়। তবে ডলফিনরা পানিতে

www.pathagar.com

বাস করে। তাদের আবাস হচ্ছে মহাসাগর আর সাগরে। আর একটি খবর হচ্ছে পানিতে বাস করে মাছের মত আচরণ করলেও ডলফিনরার মাছ নয় স্তন্যপায়ী প্রাণী।

যদিও ডলফিনদের দেখতে মাছ মনে হয়, তারা আসলে মাছ নয়। তারা মাছের মতো পানিতে সাঁতার কাটে, তবে তারা মাছের মতো ডিম পাড়ে না। মা ডলফিন একটা ছোট্ট বাচ্চা ডলফিনের জন্ম দেয়। এই বাচ্চা ডলফিন মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয় । যারা এইরকম মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয় তাদের বলা হয় স্তন্যপায়ী প্রাণী। স্তন্যপায়ীদের রক্ত অনেক উষ্ণ বা গরম থাকে। এর মানে হলো তাদের শরীরে যে তাপমাত্রা থাকে তা সবসময় প্রায় একই রকম থাকে। মাছেদের রক্ত ঠান্ডা। পানির যে তাপমাত্রা থাকে মাছেদের রক্তের তাপমাত্রা সেই রকম হয়।

ডলফিনের শরীর

ডলফিনের শরীর এমনভাবে তৈরী যাতে সে পানির মধ্যে দ্রুত চলাফেরা করতে পারে। তাদের শরীরের সামনের দিকে দুটি ডানার মতো অংশ আছে। একে বলে Flipper। পানির মধ্যে চলাফেরা আর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তারা এই Flipper ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

বেশীরভাগ ডলফিনের পেছনে একটা লম্বা পাখনা আছে। তার এই লম্বা লেজটিকে বলে Flukes। সে তার এই Flukes দিয়ে পানিতে ঢেউ তুলে সাঁতার কাটে। পানির মধ্যে যতগুলো প্রাণী আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণী এই ডলফিন। শরীর গরম রাখার জন্য ডলফিনের চামড়ার

নীচে থাকে একটা চর্বির স্তর। এই চর্বির স্তর তার শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এমনকি ঠান্ডা পানিতেও এই চর্বির কারণে তার শরীরে তাপ ঠিক থাকে।

ডলফিনের শ্বাসযন্ত্র

সকল স্তন্যপায়ীর মতো ডলফিন ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়। তার মাথায় একটা ফুটো আছে যার সাহায্যে সে নিঃশ্বাস নেয়। সে গভীর শ্বাস নিয়ে পানির ভেতরে চলে যায়। অনেক ডলফিন পানিতে যে লাফ দেয় তাতে সে ২০০ ফুট পানির গভীরে চলে যেতে পারে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য ডলফিনকে এক থেকে দুই মিনিট পরপর পানি থেকে বের হয়ে আসতে হয়। নিঃশ্বাস নেওয়া ও তা বের করে দেওয়ার জন্য তাকে পানি থেকে বের হয়ে আসতে হয়। তার সেই ফুটো যাকে বলে হোল। এই দিয়ে সে নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে আবার নিঃশ্বাস নেয়। একবার নিঃশ্বাস নিয়ে সে পানির ভেতরে চলে যায়।

www.pathagar.com

ডলফিনের খাদ্যাভ্যাস

ডলফিন মাছ শিকার করে এবং ধরে ধরে খায়। তার সাথে সে খায় অক্টোপাস। যাকে আমরা কিলার হোয়েল বা খুনে তিমি বলছি সে পানিতে অন্য যে সব স্তন্যপায়ী প্রানী আছে তাদের খেয়ে ফেলে। তার সাথে সে খায় সমুদ্রের কচ্ছপ এবং পাখি। ডলফিন তাদের দাঁত দিয়ে তার শিকার ধরে ফেলে। অনেক ডলফিনের ২৫০টার মতো ধারালো দাঁত রয়েছে। এই দাঁত দিয়ে সে তার শিকারের মাংস কাটাকাটি করে।

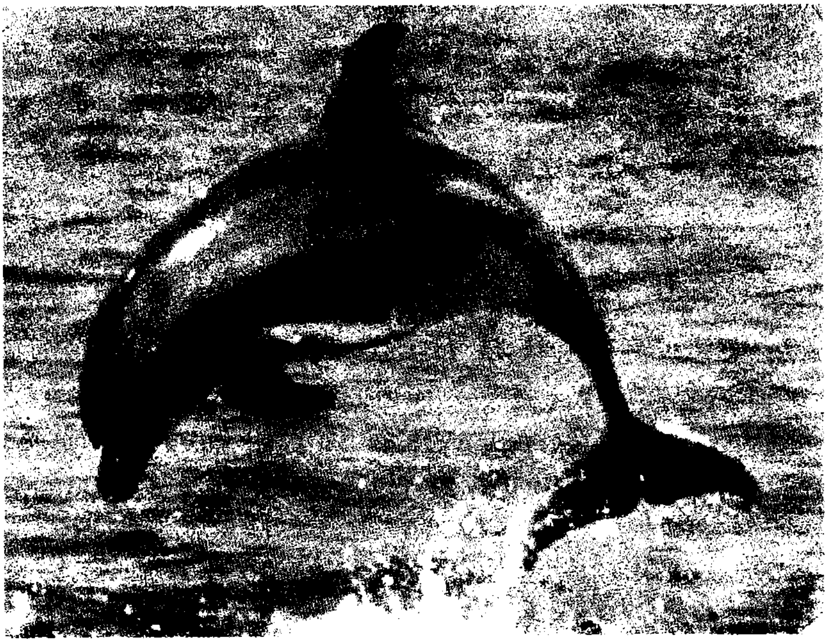

ডলফিন শব্দ তৈরী করতে পারে। একে বলে ক্লিক সাউন্ড। গভীর সমুদ্র, কাদায় ভরা নদীতে সে এই শব্দ তৈরী করে। তারপর তার প্রতিধ্বনির ফিরে আসার অপেক্ষা করে। পরবর্তীতে সে এই প্রতিধ্বনিত শব্দ শুনে বুঝতে পারে সামনে কোন বাধা আছে কিনা। আবার খাবার খোঁজার জন্যও তারা এই শব্দ ব্যবহার করে। যখন তারা শিকারে বের হয় তখন প্রায়শই একসাথে বের হয়। একঝাঁক মাছের আশে-পাশে একদল ডলফিন ঘোরাফেরা করে। শিকারের সময় হলেই একযোগে সব ঝাপিয়ে পড়ে। এর ফলে মাছেরা ডলফিনদের হাত থেকে পালাতে পারে না।

www.pathagar.com

আলাদা প্রজাতির ডলফিন

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪০ প্রজাতির ডলফিন রয়েছে। বেশীর ভাগ ডলফিনের গায়ের রঙ কালো, বাদামি অথবা ধুসর রং-এর। সবচেয়ে বড় ডলফিনের নাম হলো কিলার হোয়েল। এদের আবার ওরাকাস নামেই জানে অনেকে। একটি কিলার হোয়েল প্রায় ৩২ ফুট লম্বা হয় এবং তার ওজন হয় প্রায় ৫৪০০ কিলোগ্রাম। আর সবচেয়ে ছোট ডলফিনের নাম তাচুসি ডলফিন। এদের আকার প্রায় চার ফুট আর ওজন প্রায় ১১০ পাউন্ড হয়।

সাধারণ ডলফিন এবং বোটলনোজ বা বোতলের মতো ডলফিন এমন এক ধরনের ডলফিন যাদের চিড়িয়াখানা বা এ্যাকুরিয়ামে দেখা যায়। সমুদ্রে স্পিনার ডলফিন বলে এক ধরনের ডলফিন দেখা যায়, যারা সুমদ্রে বাতাসের উপর লাফিয়ে ডিগবাজী দেয়।

বেশীরভাগ ডলফিন সমুদ্রে বাস করে এবং তাদের সারা পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় পাওয়া যায়। বেশ কিছু ডলফিন আছে যারা নদীতে বাস করে। নদীর পানি লবণাক্ত নয়। তাই এখানে যারা বাস করে তাদের রিভার ডলফিন বলে।

www.pathagar.com

বুদ্ধিমান ডলফিন

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন ডলফিনরা কুকুরের মতোই বুদ্ধিমান। ডলফিনরা একে অন্যের সাথে যোগাযোগ তৈরী করতে পারে। তারা যে ভাষায় কথা বলতে পারে তার নাম হুইসেল। আসলে তারা শীষের মতো জোরে এক তীক্ষ্ণ এবং ক্লিক ধরনের আওয়াজ তৈরী করতে পারে। ডলফিনরা যখন সঙ্গীর সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন তারা একে অন্যের যত্ন নেয়। যখন কোন ডলফিন অসুস্থ বা আঘাত পায় তখন তার সঙ্গীরা তাকে পানিতে ভেসে থাকতে সাহায্য করে যাতে সে ডুবে না যায়।

সাধারণ ডলফিন

যে সমস্ত ডলফিন সারা পৃথিবীর গরম এলাকায় উষ্ণ পানির মধ্যে বাস করে এদের কমন বা সাধারণ ডলফিন বলে। সাধরণত এক শত থেকে এক হাজারের মতো ডলফিন এক হয়ে একটা দল তৈরী করে এবং তারা একসাথে ঘুরে বেড়ায়। এমন কি তারা একসাথে পানির উপর লাভ দেয়।

www.pathagar.com

ডলফিনের দাঁত

ডলফিনের চোয়ালে ধারালো দাঁত আছে। তারা শিকার ধরার জন্য এই দাঁতের ব্যবহার করে। তারা মাছ এবং অক্টোপাস শিকার করে এই দাঁত দিয়ে। অনেক ডলফিনের ২৫০টার মতো ধারালো দাঁত রয়েছে। এই দাঁত দিয়ে সে তার শিকারের মাংস কাটাকাটি করে।

বাংলাদেশের ডলফিন

কিছু প্রজাতির ডলফিন নদী ও সাগর উভয় স্থানেই দেখা যায়। যেমন ইরাবতী ডলফিন। বাংলাদেশে এরা সুন্দরবনের মিঠা পানির নদী আর বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করে। বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্রের জলভাগ অসাধারণ সব প্রজাতির জলজ স্তন্যপায়ীর জন্য খুবই উপযোগী বাসস্থান। নদীসহ যেসব উপকূলীয় জলাশয়ে নদী থেকে মিঠা পানি আসে, সেসব স্থানে ইরাবতী ডলফিন দেখা যায়। সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের জলপথে এরা শুশুকের সঙ্গে মিলেমিশেই থাকে।

সুন্দরবনের বড় নদীর খাঁড়িগুলোর পানি শুষ্ক মৌসুমে কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে এলে গোলাপি ডলফিন (Souca chinensis) সাগর থেকে খাঁড়িতে ঢুকে পড়ে। এরা আকারে শুশুকের চেয়ে বেশ বড়। গায়ের রং হালকা বাদামির সঙ্গে গোলাপি আভাযুক্ত, তবে বাচ্চাদের রং কালচে। এরা অত্যন্ত তৎপর

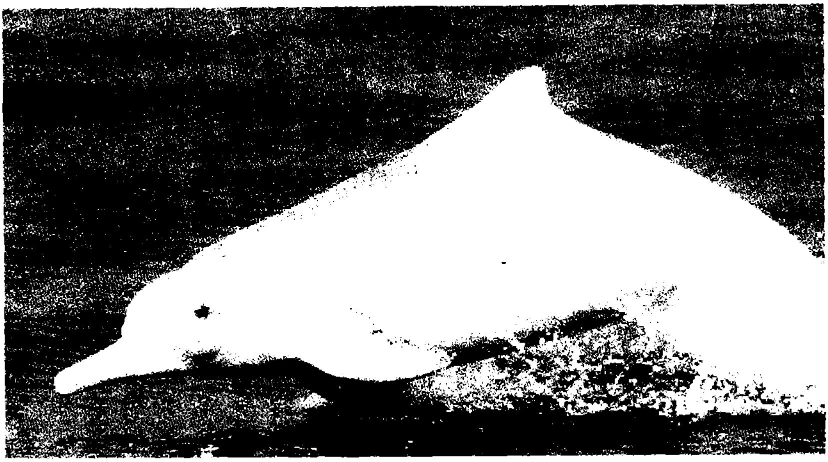

www.pathagar.com

প্রাণী, চার-পাঁচটি মিলে দল গঠন করে। এরা প্রধানত মাছ খায়, তবে কাঁকড়া, স্কুইডও এদের হাত থেকে রক্ষা পায় না। এদের পিঠের পাখা বেশ

বড়। সামগ্রিক জরিপে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর জলসীমায় প্রায় ছয় হাজার ইরাবতী ডলফিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। কিন্তু শুধু অস্তিত্ব থাকলেই হবে না; তাদের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্তির দিকে না যায় সেই লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে। তাই বিসিডিপি কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। জনসচেতনতা তৈরি করতে তারা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে নানা ধরনের বইপত্র, যেখানে ডলফিন ও তিমিবিষয়ক নানা তথ্য দেওয়া আছে। আবার সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ করে আলোচনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্থানীয় নেতা এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরাও এই সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছেন। খেলাধুলা ও ছবির মাধ্যমেও প্রাণীবৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সেই সঙ্গে একটি তথ্যচিত্র জাতীয় গণমাধ্যমে বা স্থানীয়ভাবে দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে।

বাংলাদেশের নদীর ডলফিন শুশুক

বাংলাদেশের নদীর ডলফিন হিসেবে খ্যাত শুশুক নামের স্তন্যপায়ী জলজ প্রাণী। একসময় বাংলাদেশের খুব কম নদনদীই ছিল যেখানে শুশুক দেখা

www.pathagar.com

যেত না। প্রতিকূল পরিবেশ, মানুষের বৈরিতায় আস্তে আস্তে বড় কিছু নদী ছাড়া আর সব জলাশয় থেকেই প্রায় হারিয়ে গেছে ডলফিনের এ প্রজাতি। তার পরও সাম্প্রতিক কিছু জরিপ বলছে, এখনো আশপাশের দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এই প্রজাতির ডলফিনের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

আগেই বলেছি, শুশুক হলো নদীর ডলফিন। বিশেষ আকৃতির লম্বা ঠোঁট, পিঠের ছোট ডানা আর দুই পাশের বড় পাখনার কারণে শুশুক দেখতে একটু অদ্ভুত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র নদীর সব জায়গাতেই শুশুকের বাস। জন্মান্ধ এই প্রাণীটাকে বাংলাদেশ, ভারত এবং নেপালের কিছু নদী ছাড়া কোথাও দেখা যায় না। নদীর ডলফিন সাগরের ডলফিনের দুরসম্পর্কের আত্মীয়। এদের ঠোঁট লম্বা এবং চোখ খুব ছোট।

শুশুকের দৃষ্টিশক্তি খুবই দুর্বল। নদীর যে ঘোলা পানিতে এদের বসবাস, সেখানে দৃষ্টিশক্তির খুব একটা প্রয়োজন হয় না। এর বদলে এদের ইকোলোকেশনের শক্তি অনেক প্রখর। চলাচলের সময় জলজ স্তন্যপায়ীরা প্রতিধ্বনিত শব্দ দিয়ে মস্তিষ্কে প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। শুশুকের শরীরের দুই পাশের বড় পাখনা ও নমনীয় ঘাড়ের জন্য এরা সহজে চলাচল করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, এরা কাত হয়ে সাঁতার কাটে। বড় পাখনার সাহায্যে এরা নদীর তলদেশ ছুঁয়ে পথ নির্ধারণ করে।

এরা কিন্তু মোটেই সমাজবদ্ধ নয়। সাধারণত একাই থাকে। তবে অনেক সময় নদীর বাঁকে ও মোহনায় ছোট ছোট দলে দেখা যায়। ৭০-এর দশকের পর থেকে ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ দুষন এবং অতিমাত্রায় মাছ শিকারের ফলে আশঙ্কাজনক ভাবে এই প্রাণীটার সংখ্যা কমে গেছে।

www.pathagar.com

এছাড়া, জলজ স্তন্যপায়ীদের জন্য একটি সংরক্ষিত এলাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে বিসিডিপি। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আর উত্তরে মংলা বন্দর, পূর্বে বলেশ্বর আর পশ্চিমে পশুর নদকে সীমা ধরে মাঝখানে পূর্ব সুন্দরবনের নির্ধারিত অংশকে এই সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে সংরক্ষিত এলাকায় চিংড়ি মাছের পোনা ধরায় সুক্ষ্মজালের ব্যবহার বন্ধ ও পানিদুষণ রোধ করা গেলেই জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীরা অবাধে বিচরণ করতে পারবে।

জলজ স্তন্যপায়ীর অবাধ বিচরণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধির লক্ষ্যেই বিসিডিপি ৯ থেকে ১২ অক্টোবর শিশু একাডেমীতে আয়োজন করে বাংলাদেশে প্রথম শুশুক মেলা। চার দিনব্যাপী এই মেলায় বিপুলসংখ্যক দর্শক উপস্থিতি প্রমাণ করে জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীবৈচিত্র্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ আছে।

সবসময় চলমান ডলফিন

বৈচিত্র্যে ঘেরা আমাদের এ পৃথিবী। আরো বৈচিত্র্যময় সমুদ্রের তলদেশ। সমুদ্রের তলদেশে কি আছে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। স্থলপথে বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু আবিষ্কার করলেও সে তুলনায় জলপথে বিজ্ঞানীরা এখনো যোজন যোজন দূরে। সম্প্রতি ইতালির তরুণ গবেষকরা গেনোয়া উপসাগরে ডলফিনের জীবনযাত্রা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অবাক হলেও সত্য যে, ঘুমের মধ্যেও গোল হয়ে সাঁতার কাটে ডলফিন।

www.pathagar.com

ডলফিন এক চোখ বন্ধ করে ঘুমায়। এরা যখন ঘুমায় তখন এদের মস্তিষ্কের মাত্র অর্ধেক অংশ বিশ্রাম নেয়।

গবেষকরা আরো জানায়, ডলফিন যখন ঘুমায় তখন এরা খুব ধীরে ধীরে সমুদ্রের উপরিভাগে সাঁতার কাটে। এ সময় এরা অনবরত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। ঘুমন্ত ডলফিন এক চোখ খোলা রেখে জোড়ায় জোড়ায় সাঁতার কাটে। এদের মস্তিষ্ক খুবই সতর্ক থাকে। এ সময় একটি চোখ দিয়ে এরা সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয় করে। আরেক প্রজাতির ডলফিন রয়েছে যারা সাঁতার বন্ধ করে উপরিতলে বিশ্রাম নেয়। ডলফিনের বাচ্চারা সাঁতারের সময় তাদের মায়েদের সঙ্গে বিশ্রামের সুযোগ খুঁজে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছে, এদের ঘুম সংকীর্ণ হওয়ার কারণে কখনো এরা স্বপ্ন দেখতে পারে না।

ডলফিন দেখতে খানিকটা তিমির মতো মনে হলেও এদের জীবনযাত্রা অন্যসব প্রাণীর চেয়ে ভিন্ন। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াও ভিন্ন প্রকৃতির। মাঝে মধ্যে এরা সমুদ্রের একেবারে উপরিতলে অবস্থান করে। আবার চলে যায় গভীর তলদেশে। Blow Hole নামে সমুদ্রে এক ধরনের গর্ত থাকে সেখানে জলজ প্রাণীরা শ্বাস গ্রহণ করতে আসে। ডলফিনও এ Blow Hole-এ শ্বাস গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

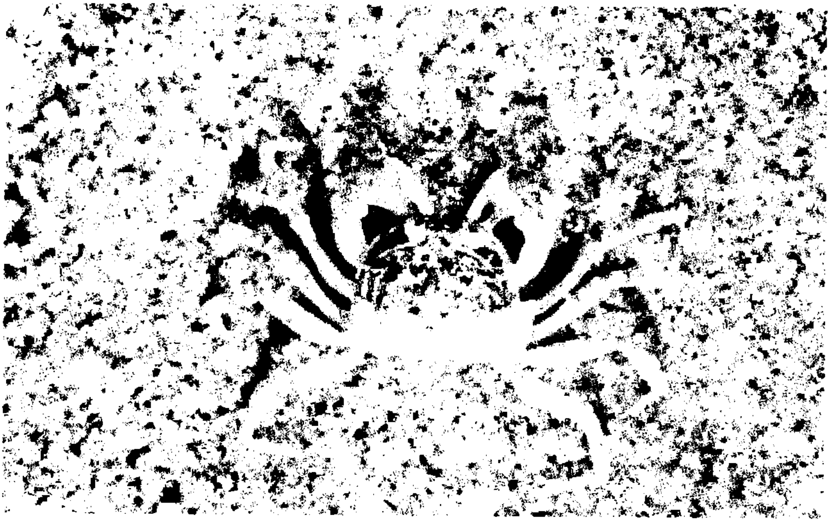

স্যান্ড-বাবলার ক্র্যাব

সামুদ্রিক বিভিন্ন সুদর্শন মাছ কিংবা প্রাণীদের মধ্যে স্যান্ড বাবলার ক্র্যাব অন্যতম। সুদৃশ্য রঙিন কাঁকড়ার অপর নাম স্যান্ড-বাবলার ক্র্যাব। আটলান্টিক মহাসাগরের ক্রান্তীয় অঞ্চলের গভীর পানিতে এদের দেখা মেলে।

লাল-নীল-সাদা বর্ণালী তার রঙ। চোখ দুটিও ভারি অদ্ভুত। মাথার সামনে খাড়া একজোড়া ডান্ডির ওপর বসানো চোখ। তবে ওদের আসল মজার ব্যাপারটা অন্যখানে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য নাকের কোন প্রয়োজন নেই স্যান্ড বাবলারের। ওরা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ সারে শরীরের দুইপাশে পাঁচ-পাঁচ দশ পা দিয়ে। ইদানিং সাগরের বিভিন্ন বৈরি পরিবেশের কারণে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার অগভীর সাগরের পানিতেও দেখা যায় এই কাঁকড়াগুলোকে। খুদে এই কাঁকড়াগুলোর প্রতিটা পায়ে রয়েছে অক্সিজেন টেনে নেওয়ার জন্য একজোড়া করে ডিস্ক।

বিজ্ঞানীরা একসময় মনে করতেন এই ডিস্কগুলো পাতলা টিসু দিয়ে তৈরি এবং শ্রবণেন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে থাকে; কিন্তু এখন তারা জানতে পেরেছেন এই ডিস্কগুলো দিয়ে অক্সিজেন ঢুকে রক্তের নিচে একটা পাতলা স্ত রে গিয়ে জমা হয়। আর এতেই প্রাণীগুলো বেঁচে থাকে।

www.pathagar.com

কোপ্পড

সম্প্রতি বিচিত্র সামুদ্রিক প্রাণীর তালিকায় চলে এসেছে কোপ্পড নামের এক ধরনের সামুদ্রিক চিংড়ি মাছ। হিসাব করে দেখা গেছে প্রাণিরাজ্যে সবচেয়ে দ্রুত লাফ দিতে পারে এই প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি। লম্বায় মাত্র এক থেকে দুই মিলিমিটার। কিন্তু ছুটতে পারে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪ মাইল বেগে! আনুপাতিক বিচারে যা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতার একজন মানুষের ৩৮০০ মাইল গতির সমান!

একই জাতীয় অন্য প্রাণীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে শরীরের পেশি দশগুণ দ্রুত নাড়াতে সক্ষম কোপ্পড। ডেনমার্কের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির থমাস কার্বো জানান, শরীরের আকার অনুযায়ী প্রাণীটির শক্তি অস্বাভাবিক। তিনটি কোপ্পডকে উচক্ষমতাসম্পন্ন ভিডিও ক্যামেরার পর্যবেক্ষণে রেখে এর গতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। মাইলের পর মাইল এরা লাফিয়ে চলতে পারে ভীষণ গতিতে। ছুটে চলার জন্য কোপ্পড তার চারটি পা'ই সমানতালে কাজে লাগাতে পারে। মানুষ কিন্তু হাঁটার সময় একসঙ্গে দুটো পা সামনে বাড়াতে পারে না। আর শুধু সাগরেই নয়, স্থলেও বেশ দ্রুত লাফাতে পারে কোপ্পড।

www.pathagar.com

সাকার মাউথ ক্যাট ফিশ

সাকার মাউথ ক্যাট ফিশ। আদি নিবাস আটলান্টিক মহাসাগরের অগভীর পানির নিচের জগতে। ট্যাংরা মাছের মতো দেখতে তিন কাঁটাবিশিষ্ট সাকার মাউথ ক্যাট ফিশের গায়ের রং তামাটে। শরীরে কোন আঁশ নেই। অন্য মাছের চেয়ে এর শরীর শক্ত ও খসখসে। অল্প পানি ও বৈরী পরিবেশে মাছটি সহজে বেঁচে থাকতে পারে।

তার এই ক্ষমতার জন্য ইদানিং মিষ্টি পানির নদনদীতেও এই মাছটির দেখা পাওয়া গেছে। তবে স্রোত সমৃদ্ধ নদীতেই এই মাছের দেখা পাওয়া গেছে। প্রজনন ক্ষমতা খুব বেশি বলে মাছটি অল্প সময়ের মধ্যে খালবিল, নদীনালা, পুকুর-দিঘিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। দুই রকম সাকার ফিশ রয়েছে Black ও হোয়াইট।

সাকার মাউথ ক্যাট ফিশের বৈজ্ঞানিক নাম 'হাইপোস টোনাস পেলিটোসনাস'। পানির তলদেশে বাস করে মাছটি স্যাকিং করে খাবার খায়। পানির নিচে বসবাসরত অন্য মাছের জন্য এই মাছটি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ মাছটি যে কোন বৈরী পরিবেশে বাঁচতে পারে।

www.pathagar.com

সামুদ্রিক ক্রীল

সমুদ্রের প্রায় দুই হাজার ফুট গভীরে এমন এক ধরনের চিংড়ি জাতীয় প্রাণী পাওয়া গেছে যেটা কিনা শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে সবুজ রংয়ের আলোর বোমা তৈরি করতে পারে। পায়ের দিকে থলের ভেতর থাকে ওই আলো-বোমার উপকরণ। সময়মতো ওটা ফাটিয়েই আলো ছড়ায় প্রাণীটা। আর এতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় সামনে আক্রমণরত শত্রু। আর এই সুযোগে লেজটাকে বাঁকিয়ে উল্টোদিকে প্রাণপনে পালিয়ে যায় মাছটি। এই মাছের আকার, আয়তন এমনকি আচার আচরণের দিক থেকেও পুরোপুরি চিংড়ি মাছের মতো বলে বৈজ্ঞানিকরা এই মাছকে ক্রীল জাতীয় প্রাণীর আওতাভূক্ত করেছেন।

ভয়ংকর জেলি ফিশ

জেলি ফিশ দেখতে বেশ সুন্দর হলেও কিছু জেলি ফিশ ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। এমন কিছু জেলীফিস রয়েছে যার সংস্পর্শে এলে মানুষের মৃত্যু হতে ১০ সেকেন্ডের বেশি লাগে না। জেলীফিস দ্বারা বছরে প্রায় ১০০টির মতো দুর্ঘটনা ঘটে।

জেলিফিশ খুবই সতর্ক। আর তাই শিকারীর হাতে ধরা পড়ার পর এটি চমৎকার আলোকচ্ছটা তৈরি করতে শুরু করে। এই আশায় যে অন্য কোন প্রাণী এসে শিকারিকে আক্রমণ করবে, আর প্রাণে বেঁচে যাবে জেলিফিশ। গভীর সমুদ্রের জেলিফিশ অ্যাটোলা ওয়াইভিলের ভেতর আছে এ ধরনের সতর্ক আলো তৈরির দারুণ ক্ষমতা।

www.pathagar.com

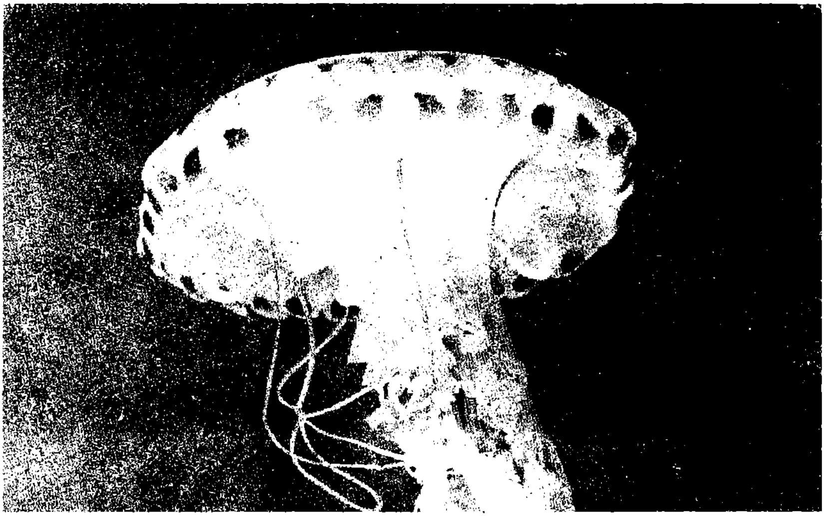

বিগ রেড জেলিফিশ

মন্টিরে বে অ্যাকোরিয়াম রিসার্চ ইনিটিউটের গবেষকরা প্রশান্ত মহাসাগরের তিন হাজার মিটারেরও বেশি গভীরে রিমোট কন্ট্রোল ক্যামেরা ব্যবহার করে সমুদ্রের গভীরে বসবাসকারী প্রাণীদের জীবনযাত্রার ছবি তুলছিলেন। হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটি বড় আকারের এবং এক মিটার

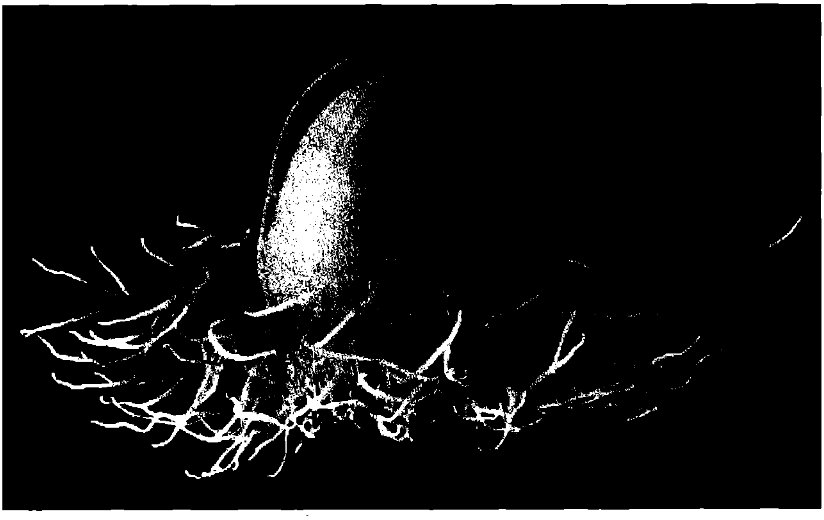

www.pathagar.com

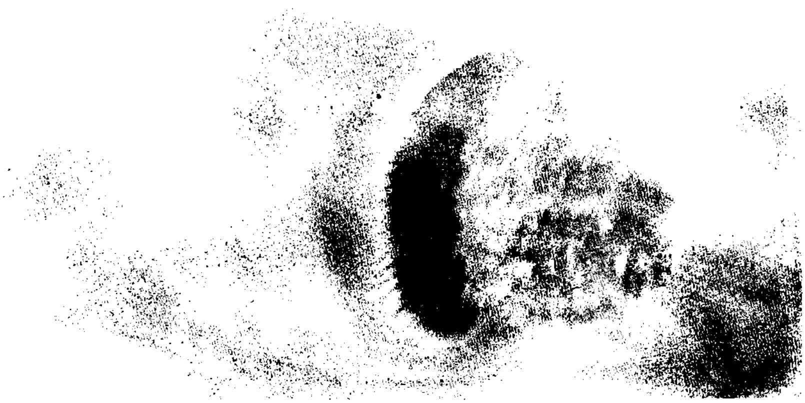

চওড়া জেলিফিশ বেরিয়ে আসে। শুঁড় না থাকার কারণে এ জেলিফিশ অন্য জেলিফিশের থেকে আলাদা, শুঁড়ের বদলে খাবার ধরার জন্য এরা মাংসল হাত ব্যবহার করে। বিজ্ঞানীরা এখনো জানেন না এরা কী খায়।

সী হর্স বা সিন্ধুঘোটক

সী হর্স বা সিন্ধুঘোটক ঘোড়ার মত এক প্রকার জলজ প্রাণী। বাস্তবে ঘোড়ার সাথে এর কোন মিল নেই। লম্বায় বড় জোর ফুটখানেক হয়। এরা

www.pathagar.com

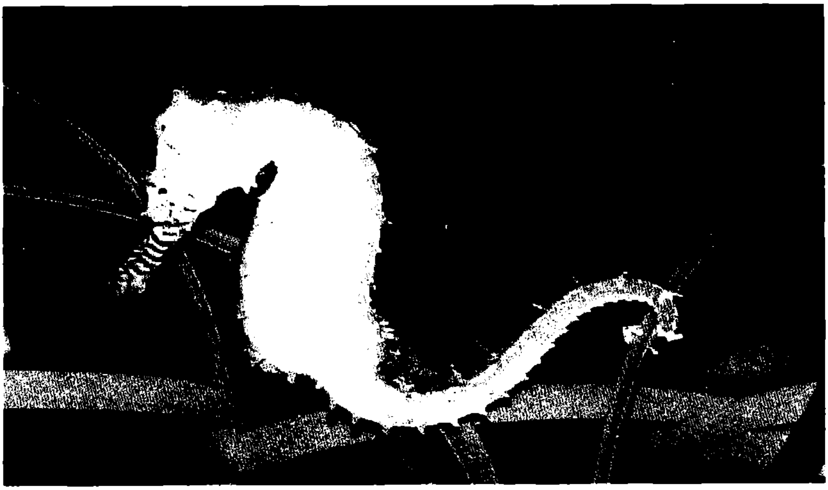

খাড়া হয়ে চলে, আর পানির তলায় গাছপালা পেলে তাতে লেজটাকে জড়িয়ে ধরে বিশ্রাম করে। কুমীরের লেজের মত এদের লেজের গড়ন। সিন্ধুঘোটক শুধুমাত্র তাদের দেহের আকৃতির জন্য বৈচিত্র্যময় নয়।

প্রজাতিভেদে মা সিন্ধুঘোটক উজ্জ্বল গোলাপী রঙের ডিম পাড়ে ১০০০ থেকে ১৫০০ এর মত। আর বাবা সিন্ধুঘোটক সেগুলো বুকের থলিতে রেখে যত্ন করে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়া পর্যন্ত। নারী প্রজাতির প্রাণীরা এই ডিমগুলোকে লম্বা টিউব দিয়ে পুরুষ প্রজাতির লেজের নীচে মৌচাকের মত

www.pathagar.com

জায়গায় জমা করে। এই জায়গাটির নাম "তা দেয়ার জায়গা" (Brood Patch)। ডিমগুলো এখানে ৮ সপ্তাহের মত থাকে। বাচ্চা প্রস্ফুটনে সাহায্য করার জন্য পুরুষরা তাদের লেজ বারবার নড়াচড়া করে থাকে। সাধারণত শান্ত, হালকা ঠাণ্ডা পানিতে এরা বাস করে। অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র উপকুল এদের প্রধান বাসস্থান। দূষণের কারণে এদের জীবন বিপন্ন হবার কারণে অস্ট্রেলিয়া সরকার ১৯৮২ সাল থেকে এদেরকে সংরক্ষিত প্রাণী হিসেবে রক্ষা করে

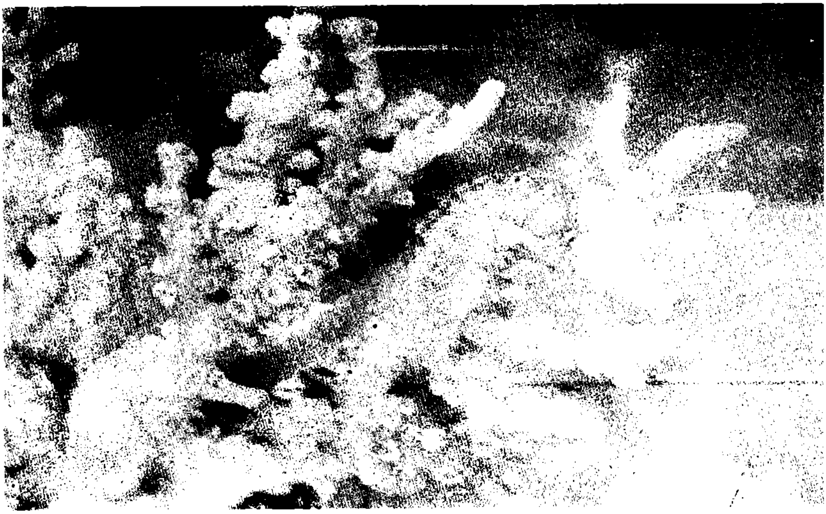

www.pathagar.com

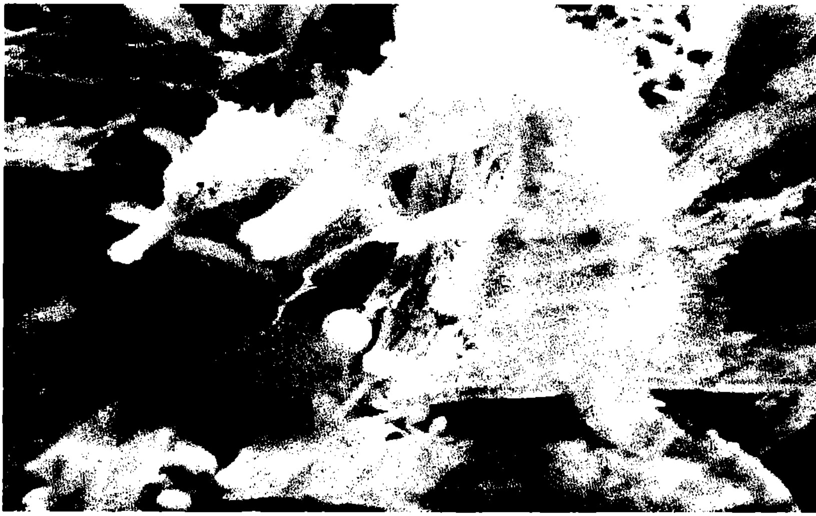

আসছে। জন্মের পর বাচ্চার দেখাশুনা করে না সিন্ধুঘোটক। কিন্তু উচ্চ তাপমাত্রার কারণে মাত্র ০.৫ শতাংশ বাচ্চা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। এর ইংরেজী নাম Leafy Seadragon ও বৈজ্ঞানিক নাম Phycodurus eques । চীন পুরাণ থেকে এদের নামকরণ করা হয়েছে।

সাগরের অগভীর এলাকা যেখানে নানারকম শৈবালের জঙ্গল গড়ে ওঠে, সেখানে এদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। ৫০ মিটারের বেশি গভীরে পাথর ও সাগরের তলদেশের ঘাসের ফাঁকে এরা বাস করে। গায়ের রং, শরীরে কিছু

www.pathagar.com

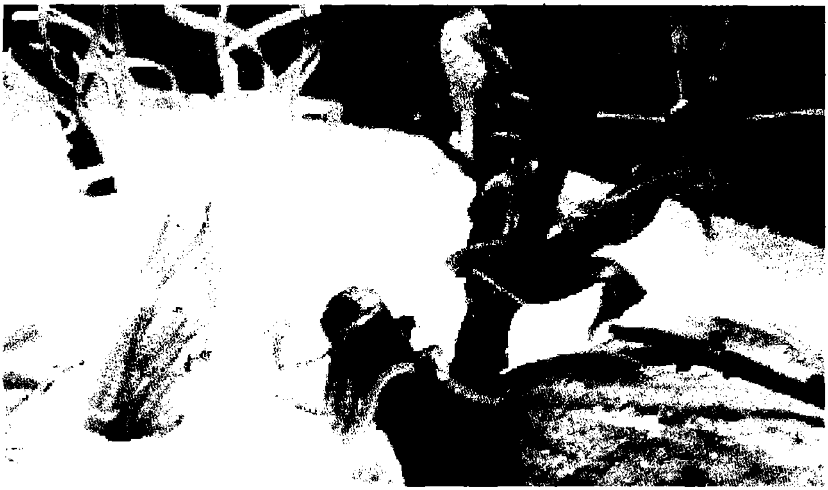

বর্ধিত অঙ্গ সবকিছুই শ্যাওলার মত। এদের শরীরে সবুজ, কমলা বা সোনালী আভার মত রঙের মিশ্রণ দেখা যায়। আগাছা সদৃশ শরীরের পাতার মত অংশগুলো এদেরকে শ্যাওলার ফাঁকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে। তাকিয়ে থাকলেও চোখে পড়ে না। শুধুমাত্র অনুসন্ধানী অভিজ্ঞ চোখ এদেরকে দেখতে পায়। কাঁপতে থাকা হালকা রঙের পাখনা ও এদিক ওদিক তাকানো চোখ দেখে এদেরকে চিহ্নিত করা যায়। এরা লম্বায় প্রায় ১৮ ইঞ্চি বা ৪৫ সে.মি. এর মত হয়।

UM

www.pathagar.com

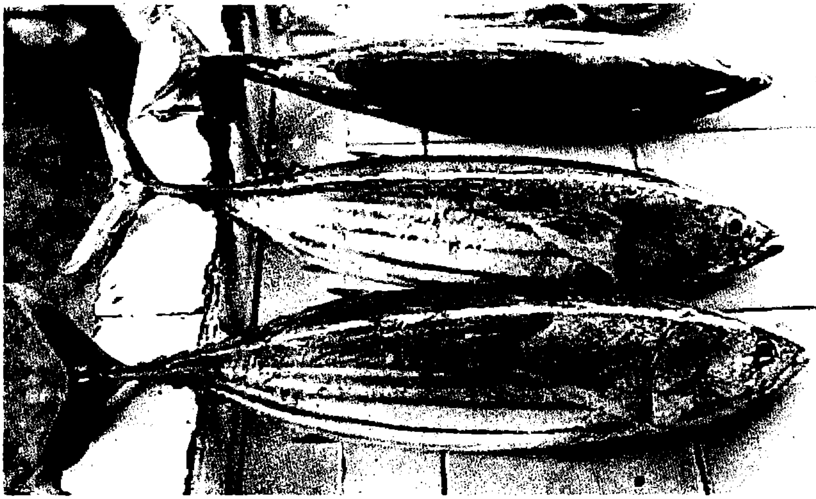

গভীর পানির টুনা মাছ

আটলান্টিক মহাসাগরের সুনীল পানির গভীরে বসবাস করে নীল পাখনাওয়ালা টুনা মাছ। পাশ্চাত্য বিশ্বে খাদ্য হিসেবে টুনা মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে এই মাছের জনপ্রিয়তা থাকলেও এই মাছটির ৭৫ ভাগ শিকার এবং খাদ্য হিসেবে সরবরাহের ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে জাপান। জাপানে টুনা মাছ একটি জনপ্রিয় খাদ্য হিসেবে স্বীকৃত। নিজের দেশের চাহিদা মিটিয়ে জাপান এই মাছ বিশ্বের

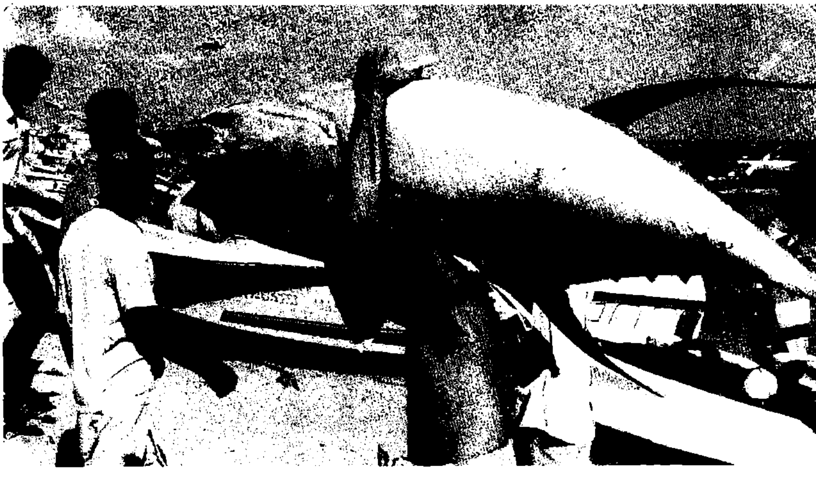

www.pathagar.com

অন্যান্য দেশে রপ্তানী করতে পারে। আটলান্টিকে টুনা শিকার করে সাধারণত ভূ-মধ্য সাগরের তীরবর্তী দেশগুলো। এই কারণে জাপানে টুনা মাছের দারুণ কদর।

সমুদ্রের ফিন টুনা বা নীল পাখনা টুনা শিকার নিষিদ্ধের ঘোষণা করেছে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর দ্য কনজারভেশন অব আটলান্টিক টুনা বা আইসিসিএটি। তারা হুশিয়ারি দিয়ে বলেছে, অবাধে শিকার করতে করতে

www.pathagar.com

এই প্রজাতির টুনা বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে। এখন মাত্র ১৫ শতাংশ টিকে আছে এই টুনা। শিকার বন্ধ না করলে অদূর-ভবিষ্যতে এই সুস্বাদু প্রজাতির মাছটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফিন টুনাকে বাঁচাতে হলে এর শিকার নিষিদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

টুনা মাছ ঘণ্টায় ৯ মাইল বেগে সাঁতরে বেড়ায় এবং গোটা জীবদ্দশায় কোন থামাথামি নেই এ মাছের। চলছে তো চলছেই। তাতে ১৫ বছরের একটি টুনা মাছ গড়ে ১০ লাখ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

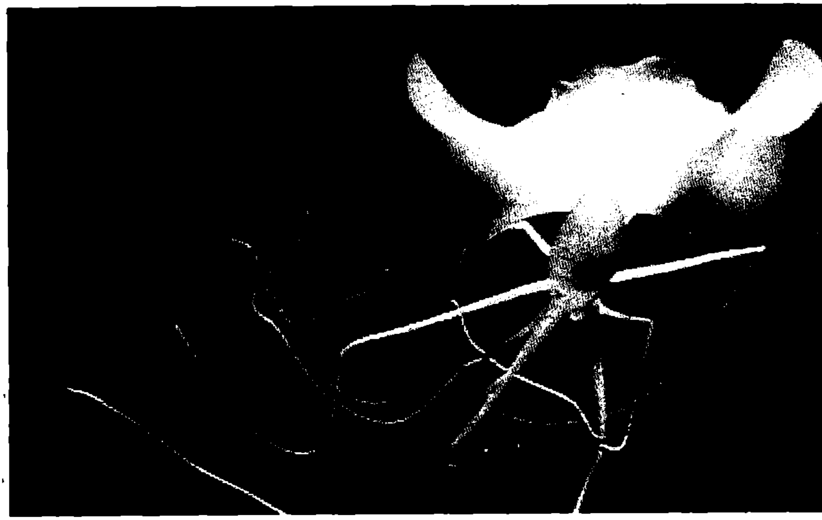

আলোময় স্কুইড

সাগরের গভীরের অন্ধকারে আলো জ্বালাতে সক্ষম একটি প্রাণী হাওয়াইয়ান ববটেইল স্কুইড ইউপ্রিমনা স্কোলোপস। এটি আলো উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়া ভাইব্রিও ফিশারিকে নিজ দেহে জায়গা দেয়। সেইসঙ্গে তাদের আলোর উজ্জ্বলতা কেমন হবে তাও ঠিক করে দেয়।

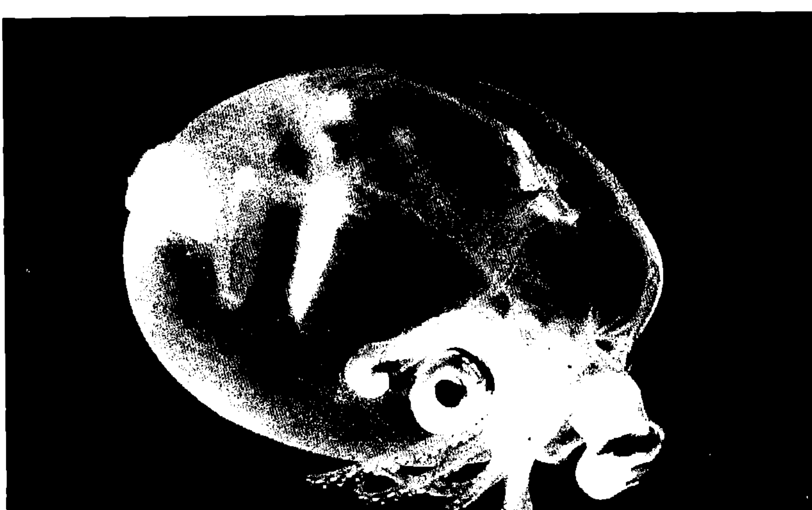

www.pathagar.com

কানা মাছ স্টিজিখথিস টাইফলপস

একসময় ব্রাজিলের সমুদ্রে প্রচুর Stygichthys typhlops বা কানা মাছ পাওয়া যেত। এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এই মাছটির শেষ দেখা হয়েছিল মানুষের সঙ্গে। এরপর মাছটিকে বিলুপ্ত প্রজাতি হিসেবে গণ্য করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মাছ বিশেষজ্ঞরা সেরকমই বলেছিলেন। তবে সম্প্রতি আবার মাছটির দেখা পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। পানিতে নয়, একেবারে মাটির নিচে, অনেক গভীরে। আর পুনরায় খুঁজে পাওয়া মাছটি পুরোপুরি অন্ধ।

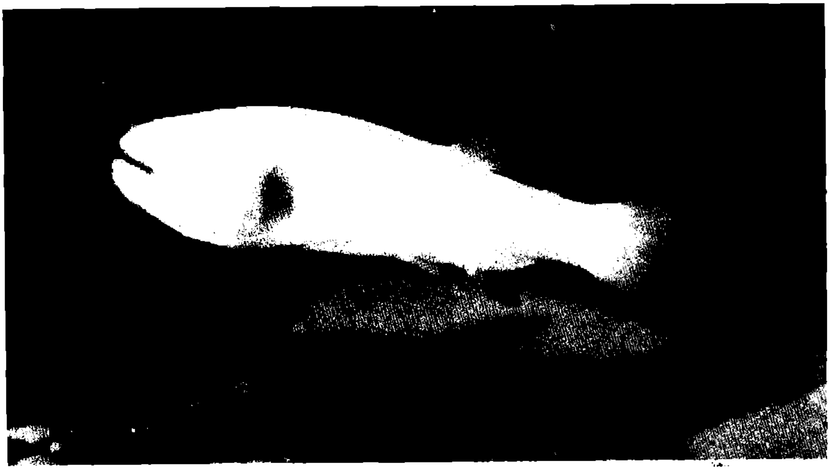

www.pathagar.com

ফ্লাইং ফিশ বা উড়ন্ত মাছ

প্রাণীজগতের হিসাব অনুযায়ী একমাত্র খেচর প্রাণীরাই আকাশে উড়তে পারে। পাখিদের মধ্যে আবার মরু অঞ্চলের উটপাখি, দক্ষিণ আমেরিকার রিয়া পাখি, অস্ট্রেলিয়ার এমু পাখি, ব্রাজিলের নান্দু নামের পাখি উড়তে পারে না। তাদের ডানা দুটো দেহের তুলনায় এত ছোট যে বিশাল দেহটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য তাদের নেই। উটপাখি এবং রিয়া পাখি ঘণ্টায় প্রায় ৪০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। এমু পাখি ছোটে ঘণ্টায় প্রায় ৪৫ মাইল। আবার জলজ প্রাণীদের মধ্যেও বিপরীত চরিত্র। উড়ুক্কু মাছ পানিতে বাস করে। নামেই মাছ, তবু তারা পানির চেয়ে শূন্যে চলাফেরা অর্থাৎ উড়তেই

বেশি পারদর্শী। ইংরেজিতে তাদের নামকরণ করা হয়েছে Flying ফিশ। আর গতিবেগ? সেও অবিশ্বাস্য। তারা অনায়াসে ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে পারে।

বুল মাছ বা ব্যাথোসাইরো

ব্যাথোসাইরো নামের জ্বলজ্বলে সামুদ্রিক প্রাণীটির বাস সমুদ্রের মাঝামাঝি গভীরতায়। সহজেই এটি কুঁকড়ে যায়। আর তাই এ পর্যন্ত কেবল একবার, প্রাণীটির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তা-ও সেই ১৯৭৮ সালে। এই প্রজাতির প্রাণীরা নীল ও সবুজ আলোকছটা তৈরি করতে পারে।

www.pathagar.com

ব্ল্যাক কার্প

মাছটির নাম Black কার্প। গঠনে মহাশোলের সঙ্গে মিল থাকলেও গায়ের রং কালো বলে ওই নাম। আদি নিবাস আটলান্টিক মহাসাগরে। মাঝে মাঝে এই মাছ বিভিন্ন নদীর মোহনাতে ঝাঁক বেঁধে ঘুরতে থাকে। তখন এগুলোকে ধরা হয়। খাদ্য হিসেবে এই মাছ খুবই সুস্বাদু। চীনের নদীগুলোর মোহনায় ৭০-৮০ কেজি ওজনের Black কার্প মাছ ধরা পড়ে থাকে।

বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের মোহনাতেও এই মাছটি হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৪৩ কেজি ওজনের Black কার্প ধরা পড়ার কথা শোনা গিয়েছে। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের চাঁচড়া কার্যালয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. খলিলুর রহমান বলেন, Black কার্প জাতের মাছ প্রথম এ দেশে আনা হয় ১৯৮২-৮৩ সালের দিকে।

মান্দারিন ফিশ

মান্দারিন ফিশ প্রবালের মাঝে, বিশেষ করে লেগুন এবং তীরবর্তী প্রবালের মাঝে বসবাস করতে পছন্দ করে। এরা ৬ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এদের চলন খুব ধীর। এরা সাধারণত সাগরের তলানিতে খাবার খোঁজে। তাই সচরাচর এদের দেখতে পাওয়া যায় না। এরা দিনের বেলায়

www.pathagar.com

খাবার শিকার করে থাকে। এদের প্রধান খাবার ক্ষুদ্র ক্রাস্টাসিয়া, গাস্ট্রপড (শামুক প্রজাতি), পলিকিট পোকা, অন্যান্য ছোট অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং মাছের ডিম।

মান্দারিন ফিশ দেখতে ছোট, উজ্জ্বল বর্ণের ড্রাগনেট পরিবারের মাছ। প্রশান্ত মহাসাগরের জাপান অধ্যুষিত রিয়ুকু দ্বীপের কাছে মাঝে মঝে অগভীর পানিতে এই মাছ ক্বচিৎ দেখা যায়। এই মাছের দুটি প্রজাতি চিহ্নিত করা গেছে। Synchiropus splendidus প্রজাতি দেখতে নীল রঙের। ত্বকের Cyanophore নামক Chromatophores বর্ণকণিকার কারণে এরা নীল

রঙের হয়। এদের ত্বকে আরো আছে আলো প্রতিফলনকারী কোষ, যা এই মাছকে করে তোলে আকর্ষণীয়। এদের আরেকটি প্রজাতির নাম S. picturatus। লোনা পানির একুরিয়াম ফিশ হিসাবে এই মাছ খুব জনপ্রিয়। কিন্তু একুরিয়ামে এই মাছ রাখা খুব কষ্টসাধ্য। এরা খাবারের ব্যাপারে খুব সংবেদনশীল। এদের দ্বীপদি নাম S. splendidus।

মস ফিশ

শৈবাল মাছ বা 'মস ফিস' সমুদ্রের যেখানে শৈবাল উদ্ভিদ রয়েছে সেখানে বিচরণ করে। এদের পাখনাগুলো লতার মতো লম্বা লম্বা ও আলাদা। শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা পেলে এরা দ্রুত শৈবালের সঙ্গে মিশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। তখন শত্রু বিফল মনোরথে ফিরে যায়।

www.pathagar.com

মার্বেল কোনা শামুক

এই তালিকার অন্যান্য মারাত্মক প্রাণীর মত ছোট্ট এবং সুন্দর দেখতে মার্বেল কোনা শামুকও প্রাণঘাতি হতে পারে। এর এক ফোটা বিষ এতটাই শক্তিশালী যা ২০ জন মানুষকে মারতে পারে। উষ্ণ লবণাক্ত (যদিও কদাচিৎ দেখা মেলে) পানিতে এগুলো দেখা গেলে ভুলেও সেগুলো তুলতে যাবেন না। সত্যিকার অর্থে এই শামুক তার বিষ তাদের শিকার ধরার কাজে ব্যবহার

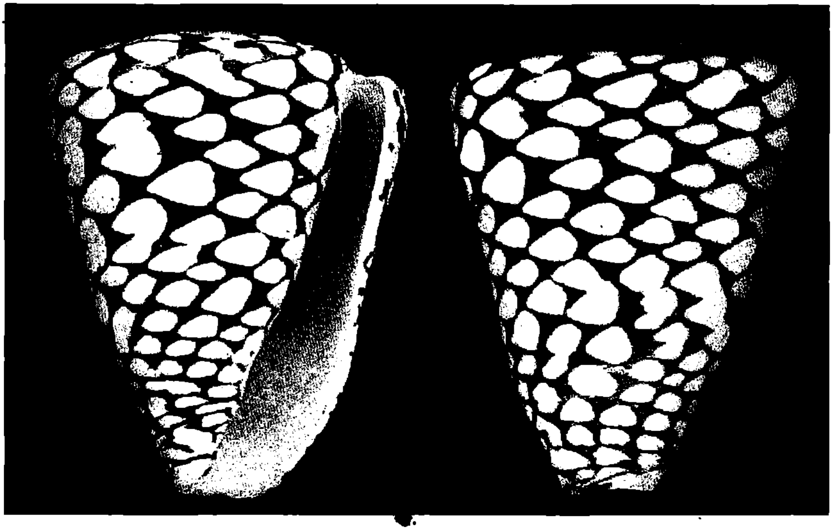

করে। আক্রান্ত হবার সাথে সাথে অথবা কয়েকদিন দেরিতেও এর লক্ষণ (উপসর্গ) বের হয়। যা তীব্র যন্ত্রণা, ফুলে যাওয়া, অনুভূতিহীন এবং ব্যাথায় টন টন করা ইত্যাদি হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মাংশপেশির সংকোচন, দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তন এবং শ্বাসকষ্ট। যার কোন প্রতিষেধক নেই। যদিও এই শামুকের বিষক্রিয়ায় মাত্র ৩০ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। এর ইংরেজী নাম marbled conc snail বা Conus marmoreus ।

স্তন্যপায়ী মাছ

আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখেছি মাছ ডিম পাড়ে। কারণ, বাজার থেকে কেনা কিংবা পুকুর বা নদী থেকে ধরা অনেক মাছের পেট ভর্তি থাকে ডিম। কিন্তু আমাদের অনেকেই জানি না, পৃথিবীর বিভিন্ন মাছের প্রজাতির মধ্যে

www.pathagar.com

কিছু মাছ ডিম পাড়ে আবার কিছু মাছ বাচ্চা দেয়। আর বাচ্চাদের জন্মের পরে মা মাছ বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, খেতে শেখায়, খেলতে শেখায়। এছাড়া, যাতে অন্য কোনো প্রাণী বাচ্চাদেরকে খেয়ে না ফেলে সে দিকেও খেয়াল রাখে মা মাছ। সবচেয়ে বড় কথা কিছু মাছের প্রজাতির বাবা মাছ কিন্তু সুযোগ পেলে নিজের বাচ্চাদের খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। তাই মা মাছকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। শুনলে অবাক হবে হয়তো, ডিম থেকে না ফুটে সরাসরি বাচ্চা দেয়া মাছের মধ্যে বিশেষ প্রজাতির মাছ তাদের বাচ্চাদের প্রাথমিক খাবার হিসেবে দুধ খাওয়ায়।

নিশ্চয় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছো তাই না? সত্যি কোন কোন মাছ তাদের বাচ্চাদেরকে দুধ খাওয়ায়। তাদের এই দুধ খাওয়ানোর বিষয়টি অবশ্য একটু আলাদা। স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীরা তাদের বাচ্চাদেরকে জন্মের পরে দুধ খাওয়ায়। কিন্তু এই মাছেরা তাদের বাচ্চাদেরকে দুধ খাওয়ায় জন্মানোর আগেই।

মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়ই এই মাছের ছানারা দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে। এরপর যখন উপযুক্ত হয়ে যায় ছানারা তখনই তারা জন্ম নেয়। এককথায় বলা যায় এই মাছের বাচ্চারা মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় দুধ খেয়ে প্রথমে শক্তপোক্ত হয় তারপর জন্ম নেয়। এই বিশেষ প্রজাতির মাছের নাম এলপাউট।

www.pathagar.com

এলপাউট মাছ ইউরোপের বিভিন্ন সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় দেখা যায়। বিশেষ করে ইংলিশ চ্যানেলের কাছে তো অনেক বেশি দেখা যায়। এদের চেহারা দেখতে অনেকটা ঈল মাছের মতো। জন্মের আগে এই মাছের বাচ্চারা পেটের ভেতর মায়ের দুধ খেয়ে প্রথমে পরিণত বয়স্ক হয়ে তারপর জন্ম নেয়।

এলপাউট মাছের মায়েরা একবারে ৩০ থেকে ৪০০টি পর্যন্ত পোনা ছাড়ে। আর জন্মের সময় একেকটি ছানা ৩ থেকে ৫ ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হয়। মায়ের পেটেই ডিম বড় হয়। তারপর পেটের মধ্যেই জন্ম নেয় খুদে খুদে ছানারা। কিন্তু মায়ের পেট থেকে বের হয় না। পেটের ভিতরে থেকেই দুধ খায় আর বড় হয়। যখন ছানাগুলোর মনে হয় তারা যথেষ্ট বড়ো হয়ে গেছে তখন তারা বেরিয়ে আসে। এভাবে মায়ের পেটে ছয়মাস পর্যন্ত কাটিয়ে দেয় এলপাউটের পোনাগুলো।

বড় হলে ছানারা পেট থেকে বের হয়ে আসে ঠিকই তবে সবসময় আবার তারা বের হয় না। তারা মায়ের পেট থেকে বের হবার জন্য শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে। পানি যখন অনেক শীতল হয়ে বরফের কাছাকাছি আসে তখনই কেবল পোনাগুলো বের হয়ে আসে।

বড় এলপাউট মাছ সর্বোচ্চ ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। আর ওজন হয় ৫ কেজিরও বেশি। এই মাছ বাস করে সমুদ্রের কিনারায় পাথরের তলায়।

www.pathagar.com

পাথরের গায়ে লেগে থাকা বিভিন্ন শৈবাল এবং অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ এই মাছগুলোর প্রধান খাবার।

এলপাউট মাছেরা পানি ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারে। পাথরের নীচে কোনো স্যাঁতসেঁতে স্থান বা সমুদ্রের কোনো আগাছার নীচেও চুপটি করে বসে থাকতে পারে। মাঝে মাঝে পানিতে থাকতে ভাল না লাগলে বের হয়ে আসে পানি ছেড়ে। এখানেও তারা খুব একটা অস্বস্তিতে থাকে না। কারণ, হলো এরা তো আসলে স্তন্যপায়ী মাছের জাত। ডাঙ্গাতেও এরা এজন্য অভ্যস্ত থাকে স্বভাবজাত কারণে।

আর্চার ফিশ তীরন্দাজ মাছ

আর্চার ফিশ বা তীরন্দাজ মাছ ভাসমান জলজ উদ্ভিদেব উপর ঝিম মেরে বসে থাকা পোকামাকড় শিকার করে খায়। এদের খাদ্য সংগ্রহের কৌশলটা বেশ চমকপ্রদ। ক্রিম-গোল্ড কালারের শরীর নিয়ে এরা চুপিসারে বসে থাকে শিকারকে ঘায়েল করা লক্ষ্যে।

কিভাবে ঘায়েল করে শিকারকে? হ্যাঁ, পানির ওপর ঝুলে থাকা গাছ-গাছড়া কিংবা লতা-পাতায় বসে থাকা কীট-পতঙ্গকে ছুড়ে মারে তীর, পানির তীর! এদের লক্ষ্য প্রায় নির্ভুল।

প্রায় চার ফুট দূর থেকেও এরা পানি ছুড়ে শিকারকে নিচে পানিতে ফেলে দেয়। হতভম্ব শিকার পানিতে নড়াচড়ার আগে তার লীলা সাঙ্গ হয়

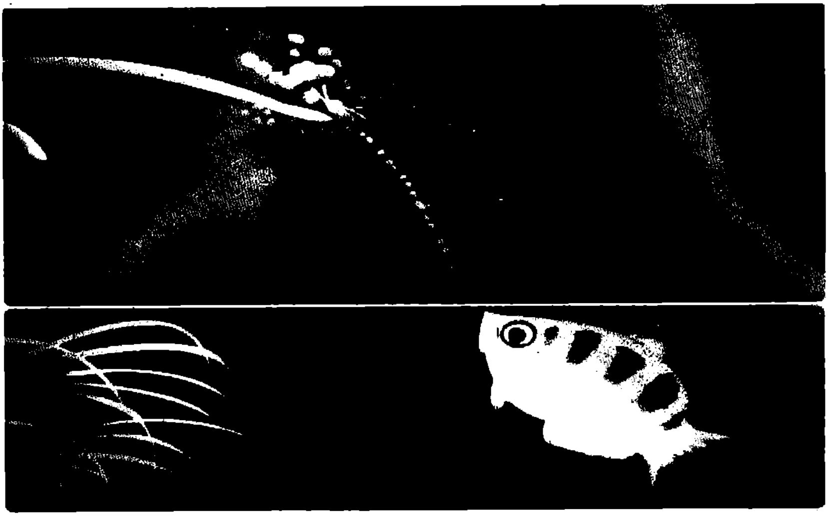

www.pathagar.com

'তীরন্দাজের পেটে' গিয়ে। ১২০ সে.মি. দূর থেকেও নিখুঁত লক্ষভেদে পানির তীর ছুঁড়তে পারে তীরন্দাজ মাছ।

তীরন্দাজ মাছের মুখের উপরিভাগ লম্বা খাঁজ কাটা। মাছটি যখন শ্বাস-প্রশ্বাস থামিয়ে দেয় তখন পানি শ্বাস-প্রশ্বাসের অংশ থেকে মুখের মধ্যে চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সে জিভটি তুলে দেয়। ফলে মুখের খাঁজকাটা অংশটি টিউবের কাজ করে এবং ফোঁটা ফোঁটা করে একই সারিতে পানি বেরিয়ে ছুটে যায় শিকারের লক্ষ্যে। স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ পানিতে বাস করে তীরন্দাজ মাছ। এদের দৈর্ঘ্য ১৮ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পাতাবহুল সাগর ড্রাগন

সাগরের অগভীর এলাকা যেখানে নানারকম শৈবালের জঙ্গল গড়ে ওঠে, সেখানে এই সাগরড্রাগনকে দেখতে পাওয়া যায়। চীন পুরাণ থেকে এদের নামকরণ করা হয়েছে।

৫০ মিটারের বেশি গভীরে পাথর ও সাগরের তলদেশের ঘাসের ফাঁকে এরা বাস করে।

গায়ের রং, শরীরে কিছু বর্ধিত অঙ্গ সবকিছুই শ্যাওলার মত। এদের শরীরে সবুজ, কমলা বা সোনালী আভার মত রঙের মিশ্রণ দেখা যায়। আগাছার মত শরীরের পাতার মত অংশগুলো এদেরকে শ্যাওলার ফাঁকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে। তাকিয়ে থাকলেও চোখে পড়ে না। শুধুমাত্র

www.pathagar.com

অনুসন্ধানী অভিজ্ঞ চোখ এদেরকে দেখতে পায়। কাঁপতে থাকা হালকা রঙের পাখনা ও এদিক ওদিক তাকানো চোখ দেখে এদেরকে চিহ্নিত করা যায়। এরা লম্বায় প্রায় ১৮ ইঞ্চি বা ৪৫ সে.মি. এর মত হয়।

জীবন্ত শৈবাল বা সমুদ্র বোলতা

সমুদ্র বোলতা বা সি-ওয়াস্প হলো সমুদ্রের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক এবং বিপজ্জনক প্রাণী। এটা এক ধরনের জেলি ফিশ বিশেষ। এদের সরু শুঁড়ের সামান্য ঘর্ষণ লাগলেই যেকোন প্রাণী পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই কারণে এদেরকে জীবন্তশৈবাল বা সমুদ্রের বোলতা বলা হয়।

এদের টেনট্যাকল বা শুঁড়গুলোর গায়ে হাজার হাজার অতি সুক্ষ্ম সুঁচের মতো কোষ থাকে। এগুলো সামান্য স্পর্শেই শিকারের গায়ে শালের মত মারাত্মক বিষ ঢেলে দেয়। উত্তর অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি সমুদ্রে প্রচুর সমুদ্র বোলতার দেখা মেলে। আটলান্টিক সমুদ্র উপকূলেও এদের একটি বিশেষ প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। এরা ঘণ্টাকৃতির বর্ণহীন জীব। এদের শরীর প্রায় ৭০ শতাংশ পানিতে পূর্ণ। খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করলে সমুদ্রতীরে এবং খাড়ির অল্প পানিতে এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এদের শুঁড়ে ৭ লক্ষ ৫০ হাজারের মতো সুঁচাকৃতি কোষ থাকে। এগুলোর সাহায্যে এরা শিকারের দেহে বিষ প্রবেশ করিয়ে দেয়। এগুলো তাদের খাদ্য সংগ্রহে এবং আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

সানফিশ

মলিয়েডি পরিবারভূক্ত সানফিশের বিজ্ঞানসম্মত নাম Ranzania laevis. এই প্রজাতির মাছ বেশী পাওয়া যায় কোরাল দ্বীপের আশেপাশে। কারণ, মাছটি কোরাল খেয়েই বেঁচে থাকে। দৈর্ঘ্যে প্রায় আড়াই ফুট এবং ওজনে ৬ থেকে ৯ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এদের আছে টিউবের মত মুখ যা কোরাল ও শৈবাল চুষে খেতে সহায়ক। এদের লেজ দেখতে অদ্ভুত যা দেখে মনে হয় কেউ যেন মাঝখান দিয়ে কেটে অর্ধেক করে দিয়েছে।

গত বছরের ২ এপ্রিল সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫০-৭০ কিমি দূরে জেলেদের জালে বিরল মাছ হিসেবে খ্যাত এই "সামুদ্রিক সানফিশ" ধরা পড়ে। মাছটি অত্যন্ত বিরল এবং বাংলাদেশের জলসীমায় এটি আগে কখনও

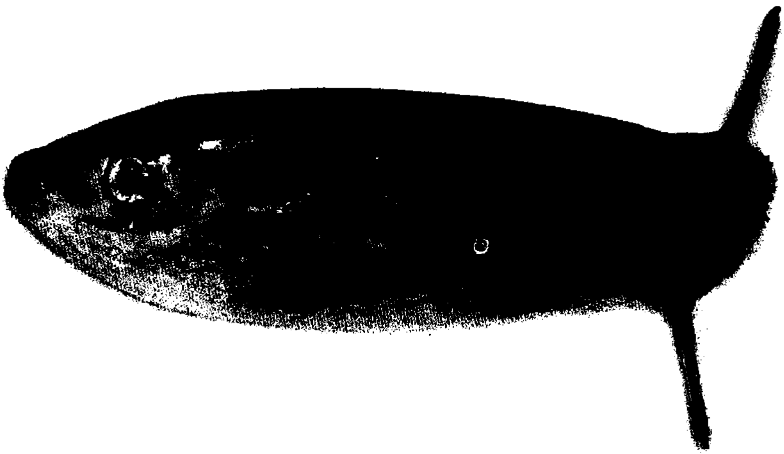

দেখা যায়নি। ৬০-৮০ ফুট অগভীর সমুদ্রে ধরা পড়ার পর বয়স্ক জেলেরাও অবাক হয়ে যায়। এটি বর্তমানে কক্সবাজারে নির্মানাধীন পানওয়া বে পার্ক (Panowa Bay Park) যাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ইলেকট্রিক ঈল মাছ

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীতে ইলেকট্রিক ঈল মাছের বসবাস। 'ইলেকট্রিক ঈল' মাছের শরীরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। এটা ওদের

www.pathagar.com

বিশেষ ক্ষমতা। আর এ ক্ষমতাকে ওরা ব্যবহার করে শত্রুর কাছ থেকে বাঁচতে এবং শিকার করার কাজে। এরা প্রায় ৫০০ ওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। দেখতে অনেকটা সর্পাকৃতির বাইন মাছের মত কিন্তু মোটা ও লম্বা।

এঞ্জেল ফিশ

এঞ্জেল ফিশ সমুদ্রের অগভীর পানির মাছ। তবে জন্মসূত্রে লোনা পানির মাছ হলেও ইদানিং এগুলোকে মিষ্টি পানির নদীতে বসবাস করতে দেখা

www.pathagar.com

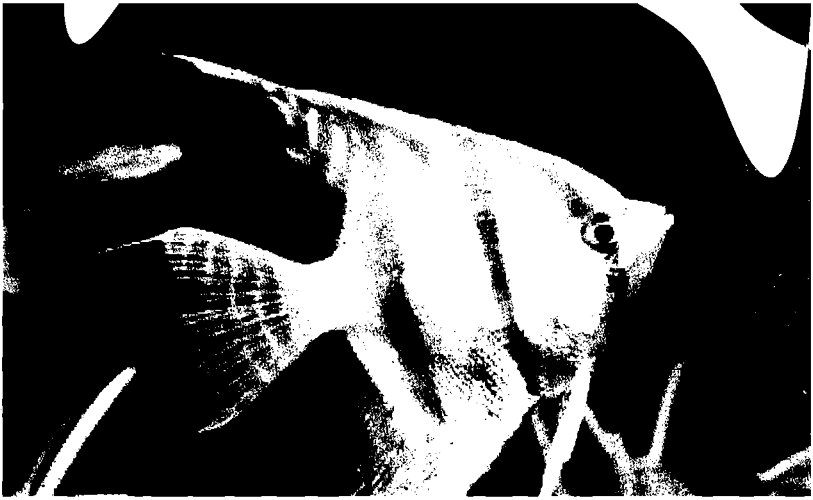

যাচ্ছে। সমুদ্রে মাছের বৈরি পরিবেশের কারণেই হয়তো তাদের এই ধরনের অভিবাসন প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারনা। তবে এখনও পর্যন্ত এদেরকে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদী (Amazon River), অরিনোকো নদী (Orinoco River) এবং এসেকুইবো নদীতে (Essequibo River) দেখা গেছে। এই মাছের সাধারণত তিনটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো হল Pterophyllum scalare,

www.pathagar.com

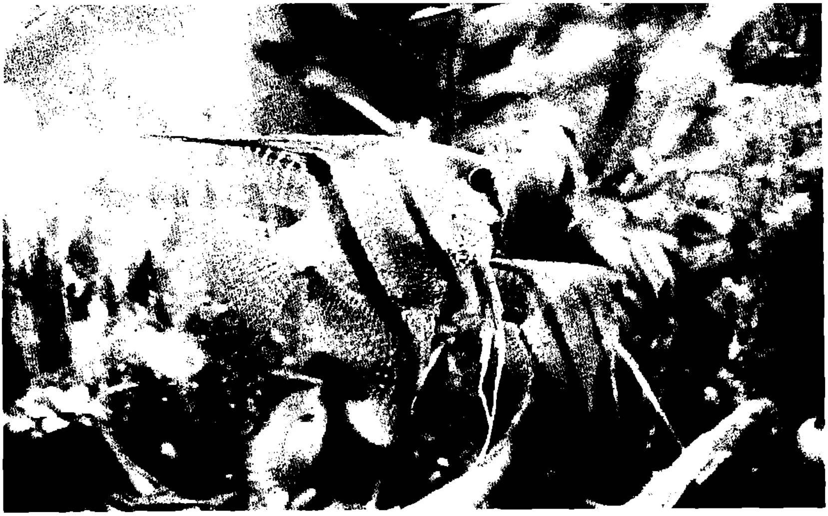

Pterophyllum altum এবং Pterophyllum leopoldi। মাছটি আমাদের দেশের রূপচাঁদা মাছের মত পার্শ্বীয়ভাবে খুব চ্যাপ্টা, দেহ গোলাকার এবং পৃষ্ঠ ও পুচ্ছ পাখনা দীর্ঘ ত্রিকোনাকৃতির। মাছের এই আকৃতি, একে পানিতে নিমজ্জিত গাছ এবং এদের গোড়ায় লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে। মাছটির দেহে আড়াআড়ি তিনটা লম্বা রঙীন দাগটানা থাকে,

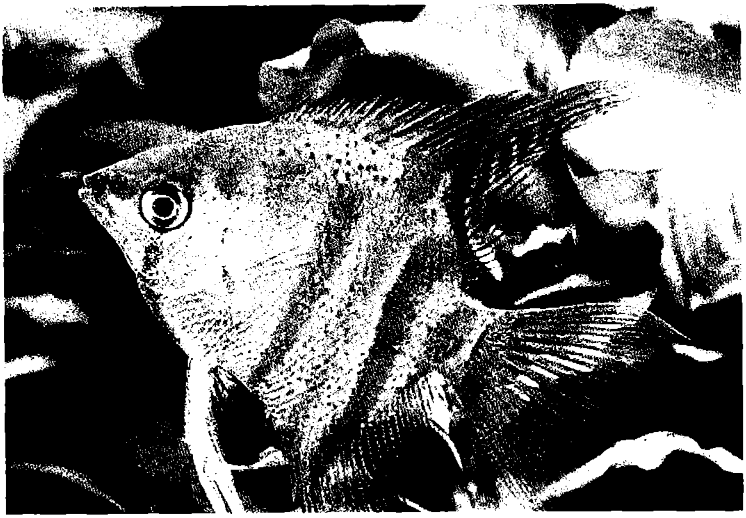

www.pathagar.com

এতে মাছটিকে গাছের বাকল বা লতাপাতার মত দেখায়। এর ফলে মাছটির লুকিয়ে থাকতে (camouflage) সুবিধা হয়। এরা অ্যামবুশ (ambush) করে শিকার ধরে থাকে। এদের খাবার সাধারণত ছোট মাছ ও অন্যান্য ছোট অমেরুদন্ডী প্রাণী। এরা জীবনসঙ্গীনি হিসেবে সারাজীবনের জন্য একটি মাছকেই বেছে নেই। এরা সাধারণত ডুবন্ত গাছের গুঁড়ি, বাকল অথবা ভাসমান কোন পাতায় ডিম পাড়ে।

www.pathagar.com

হাফেজা হক অদ্বিতী। পুরোনো ঢাকার লালবাগের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম। আর সেখানেই বেড়ে ওঠা। শিক্ষাজীবনের শুরু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এরপর ব্রিটিশ কাউন্সিলের অধীনে "এ লেভেলস" সম্পন্ন। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফাইন্যাল ইয়ারে। পুরোনো ঢাকার ঐতিহ্য আর সাংস্কৃতিক পরিবেশের কারণে লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ত ছোটবেলা থেকেই। একসময় লিখতেন কবিতা, তারপর গল্প। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ততার কারণে লেখালেখি থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হলেও একেবারে আলাদা নন। মাঝে মাঝেই কীবোর্ডে ঝড় তোলা আঙুল থেকে বেরিয়ে আসে অসাধারণ কিছু বিষয়। যা নিঃসন্দেহে মননশীলতার পরিচায়ক। আধুনিক জীবনবোধ সম্পন্ন এই লেখিকার নিজের ভেতরও পরিণত সৃজনশীলতা নিরন্তর খেলা করে। যার প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। একেবারে ছোটবেলা থেকে দেশের মানুষের জন্য ভালো কিছু করার সুতীব্র আকাঙ্খা লালন করে আসছেন অন্তরে। তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন হলো একদিন নিশ্চয় উন্নতির উন্মুক্ত সোপানে পা রাখবে সোনার বাংলাদেশ। তারপর শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তার কাছে দুটো বিষয় খুবই রহস্যময়। যার একটি জীবন আর অপরটি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাতেই তার কৌতুহল। যার ফলশ্রুতিতে এই বইয়ের প্রকাশ। আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বপ্নদ্রষ্টা লেখিকার সাফল্য কামনা করি।

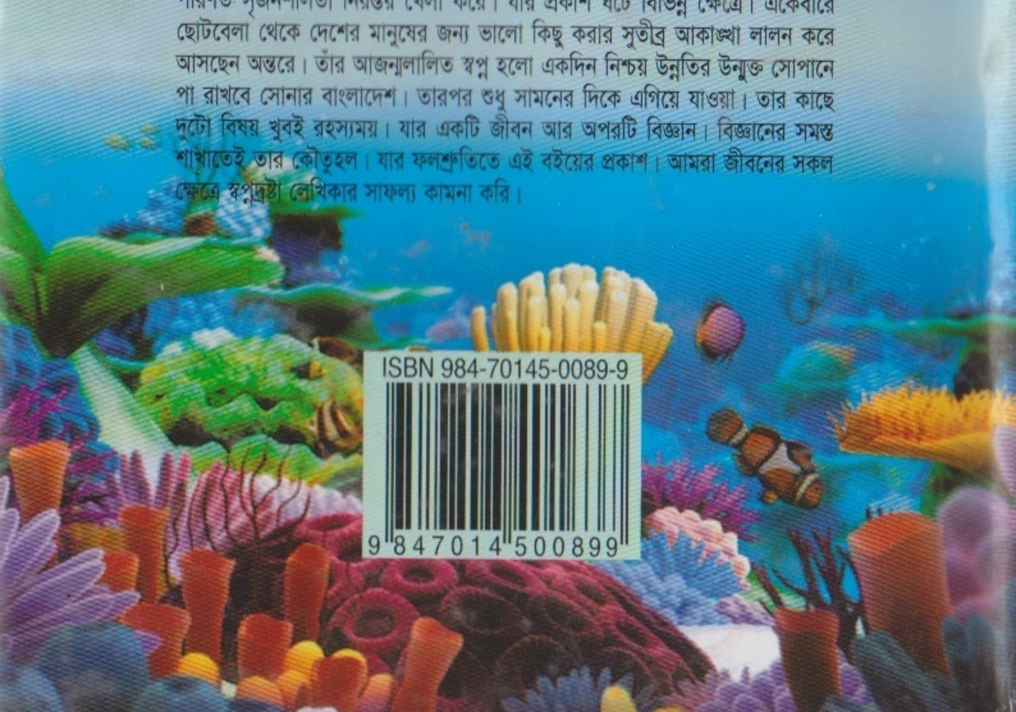

ISBN 984-70145-0089-9

9 847014 500899